মোহাম্মদ ইবনে মাছলামা (রাঃ) নিজ সঙ্গে আরও দুই ব্যক্তি সহ তাহার বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। ঐ ব্যক্তিদ্বয়কে তিনি পূর্বেই বলিয়া দিয়াছিলেন যে, কায়াব ইবনে আশরাফ আমার নিকট আসিলে কোন অজুহাতে আমি তাহার মাথার লম্বা চুল শক্তভাবে ধরিবার চেষ্টা করিব; আমি ভালরূপে তাহাকে কাবু করিয়াছি দেখিলে তোমরা তাহার গর্দান কাটিয়া ফেলিও।

কায়াব ইবনে আশরাফ নীচের তলায় নামিয়া আসিল। ঐ ছাহাবী তাহাকে বলিলেন, আপনি যেরূপ সুগন্ধি ব্যবহার করিয়াছেন এইরূপ সুগন্ধি আমি জীবনে কখনও দেখি নাই। সে বলিল, আমার রূপশী স্ত্রী সুগন্ধির অনুরাগিনী অধিক। ছাহাবী বলিলেন, আপনার মাথা হইতে একটু সুঘ্রাণ লাভ করিতে পারি কি? সে বলিল—হাঁ। এই সুযোগে ঐ ছাহাবী তাহার মাথার চুল শক্তভাবে ধরিয়া ফেলিতে সমর্থ হইলেন এবং সঙ্গিদ্বয়কে এশারায় বলিলেন, তোমাদের কার্য্য তোমরা করিয়া ফেল। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাহার গর্দান কাটিয়া ফেলিলেন। অতঃপর তাঁহারা সোজা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট চলিয়া আসিলেন।

আবু-রাফে ইহুদীর হত্যা

আবু-রাফে ইহুদীদের মধ্যে অতি বড় ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল; আরবের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ছিল; "তাজেরুল হেজাজ" হেজাজের প্রধানতম ব্যবসায়ী নামে আখ্যায়িত ছিল। ব্যবসার অছিলায় সমগ্র আরবে তাহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। ইসলাম ও মোসলমানদের ধ্বংস চেষ্টায় সে কায়াব ইবনে আশরাফ হইতে কম ছিল না। আবু-রাফে কায়াব ইবনে আশরাফেরই নানা ছিল। কায়াব ইবনে আশরাফের হত্যার পর আবু-রাফের হত্যার প্রতি মোসলমানগণ সচেষ্ট হইলেন। তাহার হত্যার সময় সম্বন্ধে মতভেদ আছে; একদল ঐতিহাসিকের মতে পঞ্চম বা ষষ্ঠ হিজরী সনে তাহাকে হত্যা করা হয়। অন্য এক দলের মতে তৃতীয় সনে কায়াব ইবনে আশরাফের হত্যার পরই এই হত্যা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইমাম বোখারীর দৃষ্টিতে এই মতের প্রাধান্য দেখা যায়। মদীনা হইতে ২০০ মাইল দূরে অবস্থিত খায়বর এলাকার শেষ সীমায়—হেজাজের সংলগ্ন স্থানে অবস্থিত তাহার বাড়ীতেই তাহাকে হত্যা করা হয়। ঘটনার বিবরণ এই—

১৪৩৮। **হাদীছ**:—বরা ইবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কতিপয় মদীনাবাসী ছাহাবীকে আবু-রাফে ইহুদীর হত্যার জন্য বিশেষ-ভাবে প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে আতীক্ (রাঃ)কে আমীর করিয়া দিলেন। আবু রাফে সর্বদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিরোধিতায় ও তাঁহার ক্ষতি সাধনে সচেষ্ট থাকিত এবং তাঁহার প্রতি আক্রমণ পরিচালনার জন্য

লোকদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করিত। সে মদীনা হইতে বহু দূরে হেজাজ (সংলগ্ন) এলাকায় অবস্থিত এক সুরক্ষিত কিল্লার মধ্যে বসাবাস করিত। তাহার হত্যার জন্য প্রেরিত ছাহাবীগণ তাহার গৃহের নিকটবর্তী পৌঁছিলে পর যখন সূর্য্যাস্ত হইল এবং গরু-ঘোড়া ইত্যাদি পশুপালমসমূহ গৃহে প্রবেশ করান হইতেছিল তখন ঐ ছাহাবী দলের আমীর আবদুল্লাহ ইবনে আতীক (রাঃ) সঙ্গীগণকে বলিলেন, তোমরা কিল্লার বাহিরেই অবস্থান কর, আমি ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য কোন কৌশল অবলম্বন করিব। এই বলিয়া তিনি কিল্লার গেটের নিকটবর্তী হইলেন এবং নাক-মুখ কাপড় দ্বারা পেঁচাইয়া এইরূপে বসিয়া রহিলেন যেন তিনি মল-মূত্র ত্যাগে রত হইয়াছেন। তখন কিল্লার ভিতরে প্রবেশকারী সকলেই ভিতরে চলিয়া গিয়াছে এবং দারোয়ান গেট বন্ধ করার জন্য আসিয়াছে। দারোয়ান ঐ ছাহাবীকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া মনে ভাবিল যে, এই ব্যক্তি এই বাড়ীরই কোন লোক, মল ত্যাগের জন্য বসিয়া আছে। এই ভাবিয়া দারোয়ান তাহাকে ডাকিয়া বলিল, হে আল্লার বন্দা! ভিতরে আসিতে হইলে চলিয়া আসুন, এখনই গেট বন্ধ করিয়া দিব।

(ঐ ছাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন—) আমি তৎক্ষণাৎ কিল্লার ভিতর ঢুকিয়া পড়িলাম এবং লুকাইয়া রহিলাম। অতঃপর সমস্ত লোক ভিতরে প্রবেশ করার পর দারোয়ান গেট বন্ধ করিয়া দিল, গেট বন্ধ করিয়া দারোয়ান গেটের চাবি একটি পেরেকের সহিত লটকাইয়া রাখিল। আবু রাফে উপর তলায় বাস করিত এবং সে গল্প-গুজারী করায় অভ্যস্ত ছিল। তাহার মোছাহেবগণ যখন চলিয়া গেল (এবং বাতি নিবাইয়া) সকলেই শুইয়া পড়িল তখন আমি আবু-রাফের অবস্থান কক্ষের প্রতি উঠিতে উদ্যত হইলাম। প্রথমেই আমি গেটের চাবি লইয়া আসিলাম এবং গেট খুলিয়া রাখিলাম, অতঃপর আমি এক একটি কক্ষের দরওয়াজা খুলিয়া অন্দর মহলের ভিতরে প্রবেশ করা আরম্ভ করিলাম। আমি প্রত্যেকটি দরওয়াজাই ভিতর দিকে বন্ধ করিয়া যাইতে লাগিলাম; এই উদ্দেশ্যে যে, আন্দর মহলের উপর তলায় যাইয়া যখন আবু-রাফের উপর আক্রমণ চালাইব তখন তাহার চীৎকার শুনিয়া যেন বাহির বাড়ী হইতে লোকজন তাহার সাহায্যার্থে আসিতে না পারে এবং সুষ্ঠুরূপে তাহার হত্যাকার্য্য সমাধা করা যায়।

এইরূপে আমি তাহার শয়নকক্ষে উপস্থিত হইলাম। কক্ষটি অন্ধকারময় এবং আবু রাফে স্বীয় পরিবারবর্গের মধ্যস্থলে শুইয়া ছিল। আমি আবু-রাফেকে নির্দিষ্ট করিতে পারিতেছিলাম না; তাই আমি আকস্মিকভাবে আবু-রাফে নাম ধরিয়া ডাক দিলাম। সে বলিয়া উঠিল, কে আমাকে ডাকিল? আমি তাহার শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তরবারি দ্বারা আঘাত করিলাম। আমি সন্ত্রস্ত ছিলাম, তাই আঘাত তাহার উপর পূর্ণ কার্য্যকরী হইল না; সে চীৎকার করিল (, কিন্তু নিদ্রায় ভারাক্রান্ত)। আমি কিছুক্ষণের জন্য ঐ কক্ষ হইতে চলিয়া আসিলাম এবং অনতিবিলম্বেই পুনরায় কক্ষের ভিতর যাইয়া আমি স্বীয় কণ্ঠস্বর পরিবর্তন

করতঃ তাহার আপন লোকের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আবু-রাফে! আপনি চীৎকার করিলেন কেন? সে বলিল, তোমাদের সর্বনাশ হউক—এই মাত্র কেহ আমাকে তরবারির আঘাত করিয়াছে! এইবার আমি তাহার শব্দের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য করিয়া এমন ভীষণ আঘাত করিলাম যে, তাহার শব্দ করার শক্তি রহিল না। কিন্তু তাহার পূর্ণ মৃত্যুও ঘটিল না, তাই আমার তরবারির ধারাল দিকটি তাহার পেটের উপর রাখিয়া অতি জোরে চাপ দিলাম, এমনকি অনুভব করিলাম যে, আমার তরবারি তাহার মেরুদণ্ডের হাড়কে স্পর্শ করিয়াছে। তখন আমি নিশ্চিতরূপে ধারণা করিলাম, আমি তাহার হত্যাকার্য্য সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছি।

অতঃপর আমি কক্ষসমূহের দরওয়াজা খুলিয়া বাহিরে আসিতে লাগিলাম। আমি একটি সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া নামিতে ছিলাম, পূর্ণিমার রাত্র ছিল; চাঁদের আলোতে তাড়াহুড়ার মধ্যে আমি ভাবিলাম, সম্পূর্ণ সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া মাটির নিকটবর্তী আসিয়াছি এবং সেই অনুপাতেই আমি পা রাখিলাম। কিন্তু বস্তুতঃ ঐরূপ ছিল না, মাটি এখনও আমার ধারণা হইতে অধিক নিম্নে ছিল, তাই আমি আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেলাম, এমনকি আমার পায়ের নলা ভাঙ্গিয়া গেল। তাড়াহুড়ার মধ্যে স্বীয় পাগড়ি দ্বারা ভাঙ্গা পা-টি বাঁধিয়া লইলাম এবং কিল্লার গেটের নিকট আসিয়া বসিয়া রহিলাম। ইচ্ছা করিলাম যে, আবু রাফের মৃত্যু সম্পর্কে সন্দেহনীন না হইয়া কিল্লার বাহিরে যাইব না। রাত্রি প্রভাতে যখন মোরগের ডাক আরম্ভ হইল তখন আবু রাফের মৃত্যু সংবাদ ঘোষিত হইল। অতঃপর আমি কিল্লার বাহিরে চলিয়া আসিলাম এবং অপেক্ষমান সঙ্গিগণকে বলিলাম, আল্লাহ তায়ালা আবু রাফেকে ধ্বংস করিয়াছেন, এখন দ্রুত এই এলাকা পরিত্যাগ কর। আমরা দ্রুত তথা হইতে চলিয়া আসিলাম এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, তোমার পা-টি লম্বা করিয়া দাও, আমি তাহাই করিলাম। তিনি উহার উপর স্বীয় হাত বুলাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমি এরূপ আরোগ্য লাভ করিলাম যে, কখনও আমার এই পা ভাঙ্গিয়াছিল বলিয়া ধারণাও করা যাইত না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—উল্লিখিত ব্যক্তিদ্বয়ের হত্যাকার্য্য, বিশেষতঃ কায়াব ইবনে আশরাফের হত্যা যেই কৌশলে সমাধা করা হইয়াছে, উহা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট সমর্থনীয় হওয়ার প্রধানতম কারণ এই ছিল যে, তিনি সর্বদা রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এড়াইয়া চলার পক্ষপাতি ছিলেন। তাই গোপন ব্যবস্থায় তাহাদের হত্যাকার্য্য সমাধা করা হয়; যেন সংঘর্ষ বাঁধিয়া অধিক রক্তপাত না ঘটে।

ওহোদের জেহাদ

ওহোদ একটি পর্বতের নাম, বর্তমানে উহা পবিত্র মদীনার শহরতলীতে পরিণত হইয়াছে। উহা শহরের কেন্দ্রস্থল হইতে ২×২॥ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। ঐ পর্বতের

সম্মুখে বিরাট ময়দান রহিয়াছে, সে স্থানেই এই জেহাদ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে "ওহোদের জেহাদ" বলা হয়। এই জেহাদটি রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক অনুষ্ঠিত জেহাদ সমূহের বড় কয়েকটি জেহাদের অন্যতম। এই জেহাদে মোসলমান যে পরিমাণ ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হইয়া আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে পরীক্ষিত হইয়াছিল রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়কালে অন্য কোন জেহাদেই এইরূপ হয় নাই, তাই ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ জেহাদ। কোরআন শরীফের বহু আয়াত এই জেহাদ সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে। বোখারী (রঃ) কতিপয় আয়াত উল্লেখ করিয়াছেন। ঘটনার ধারাবাহিক বর্ণনায় ঐ আয়াত সমূহ এবং উহার তরজমা উল্লেখ করা হইবে।

মুল ঘটনার প্রাথমিক বয়ান :—

বদর-যুদ্ধে মক্কাবাসী কোরেশরা যে আঘাত পায়, তাহাদের পক্ষে উহা ভুলিয়া যাওয়া সম্ভব ছিল না। তাহারা উহার প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর ছিল। প্রতিশোধ গ্রহণের সেই অগ্নিময় মনোবৃত্তিই ওহোদের যুদ্ধের মুল কারণ। বদর-যুদ্ধের পুর্ণ বারমাস পর— তৃতীয় হিজরী শাওয়াল মাসের সাত তারিখ কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে পনর তারিখ শনিবার দিন এই জেহাদ হইয়াছিল মোসলমান পক্ষের সৈন্য ছিল মাত্র সাত শত; সকলেই—পদাতিক, ঘোড়া কাহারও নিকট ছিল না।

কাফেররা পূর্ণ সাজসজ্জার সহিত মোসলেম জাতিকে ভু-পৃষ্ঠ হইতে নির্মুল করিয়া দেওয়ার দৃঢ় মনোভাব লইয়া মক্কা হইতে মদীনার প্রতি যাত্রা করিল। এমনকি তাহাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ স্ত্রীদেরে সঙ্গে নিয়া আসিল। আরব দেশের দস্তুর ছিল, চরম ক্ষিপ্রতার সহিত সংগ্রামে যাত্রা করিলে নারীগণকে সঙ্গে নেওয়া হইত। নারীগণ সঙ্গে থাকিলে রণাঙ্গন হইতে পলায়নে বাধার সৃষ্টি হইবে কারণ পলায়নের ইচ্ছা হইলেই মনে এই কথা জাগিয়া উঠিবে যে, আমরা পলায়ন করিলে আমাদের নারীগণ শত্রুহস্তে লাঞ্ছনা ভোগ করিবে। এতদ্ভিন্ন আরবের নারীরা সিংহী প্রকৃতির তেজস্বিনী হইত. রণাঙ্গনে আপন লোকদের মধ্যে দুর্বলতা দেখিলে তাহাদিগকে ভৎসনা ও তিরস্কার করিতে থাকিত; বীর ও বাহাদুর স্বভাবের আরব পুরুষগণ নারীদের ভৎসনা ও তিরস্কার মৃত্যুবরণ অপেক্ষা অধিক জঘন্য বোধ করিত। এতদ্ভিন্ন নারীরা নানা রকম উত্তেজনার গীত ও উস্কানীর কথা দ্বারা দলীয় লোকদেরকে ক্ষেপাইয়া তুলিত।

শত্রুপক্ষ কোরায়েশ কাফেররা মক্কা হইতে যাত্রা করিয়া দীর্ঘ পথ— ৩০০ মাইলের অধিক পথ অতিক্রম করতঃ মদীনা সংলগ্ন ওহোদ পাহাড়ের সম্মুখস্থ ময়দানে ক্যাম্প করিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) পুর্ব হইতেই তাহাদের সংবাদ জ্ঞাত হইয়া ছিলেন। তাহারা শাওয়াল মাসের চার তারিখ বুধবার মদীনার নিকটে পৌঁছিল। হযরত (দঃ) বিভিন্ন লোক পাঠাইয়া শত্রুদলের সম্পূর্ণ খবর পুর্ণরূপে জ্ঞাত হইলেন, এবং শাওয়াল মাসের পঞ্চম দিন বৃহস্পতিবার

ছাহাবীগণকে একত্রিত করিয়া পরমর্শ করিলেন। কিছু সংখ্যক ছাহাবী, এমনকি প্রকাশ্যে মোসলমান দলভুক্ত মোনাফেকদের সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনু সলুল এইরূপ মত প্রকাশ করিল যে, আমরা মদীনা শহরের বাহিরে যাইয়া সংগ্রামে লিপ্ত হইব না, বরং আমরা শহরের আভ্যন্তরিণ রক্ষা-ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিয়া শহরেই অবস্থান করিব। শত্রুদল শহরের উপর আক্রমণ করিলে তখন তাহাদের আক্রমণ প্রতিহত করা সহজ সাধ্য হইবে। কারণ, ঐ অবস্থায় আমাদের পুরুষগণ মুখামুখী আক্রমণ চালাইবে এবং নারীগণ নিজ নিজ বাড়ীর ছাদ হইতে শত্রুদলের প্রতি প্রস্তর বর্ষণ করিবে। শত্রুসেনা সংখ্যায় অধিক হইলেও এই পন্থায় সহজেই কাবু হইয়া পড়িবে।

রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজেও উল্লিখিত ব্যবস্থা অবলম্বনে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু অন্যান্য ছাহাবীগণ ঐ ব্যবস্থার বিরোধী হইলেন, তাঁহাদের বীরত্ব তাঁহাদিগকে ঐরূপে বাড়ী বসিয়া থাকিতে সম্মত হইতে দিল না। মদীনার প্রধান সরদার সায়াদ ইবনে ওবাদা (রাঃ) এবং শেরে-খোদা হামযা (রাঃ) তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন, এমনকি হামযা (রাঃ) শপথ করিয়া বলিলেন, অদ্যই মদীনা হইতে বাহির হইয়া কাফেরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা না করিয়া খাদ্য গ্রহণ করিব না। এতদ্ভিন্ন যে সমস্ত ছাহাবীগণ বদর-জেহাদে শরীক হইয়াছিলেন না এবং তাঁহারা বদর-জেহাদে অংশ গ্রহণকারীগণের ফজিলত ও মর্তবার বয়ান শুনিতে পাইয়া জেহাদের সুযোগের প্রতিক্ষায় ছিলেন, তাঁহারা এক বাক্যে বলিয়া উঠিলেন, আমরা মনোবাঞ্ছা পুরণের সুযোগ পাইয়াছি; আমরা এখন বসিয়া থাকিতে পারি না। এইরূপে মদীনার বাহিরে যাইয়া সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার মতামতের প্রাবল্যতায় রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ মতই গ্রহণ করিয়া স্বীয় গৃহে গমন করিলেন। অতঃপর পরিকল্পিত সময়ে যুদ্ধের বিশেষ পোষাক লৌহ-বর্ম পরিধান করতঃ রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া বাহির হইলেন। এদিকে যাহাদের পীড়াপীড়িতে হযরত (দঃ) সংগ্রোমের জন্য মদীনার বাহিরে যাইতে সম্মত হইয়াছেন তাঁহারা অনুতপ্ত হইতে লাগিলেন যে, আমাদের কারণে রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজ মতের বিরুদ্ধে কাজ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এই ভাবিয়া তাঁহারা হযরতের নিকট অনুরোধ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন যে, আপনার মনোভাবকেই আমরা সকলে গ্রহণ করিতেছি—মদীনার শহরে থাকিয়াই আমরা আক্রমণের প্রতীক্ষা করিব।

রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাদের এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং বলিলেন, নবী যখন যুদ্ধের পোষাক পরিধান করিয়া নেয় তখন শেষ ফল না দেখিয়া উহা পরিত্যাগ করেন না। এই বলিয়া তিনি বাহিরে অবস্থানরত শত্রুদলের উপর আক্রমণ উদ্দেশ্যে মদদীনা হইতে বাহিরে যাওয়ার উপরই দৃঢ় রহিলেন। ৬ই শাওয়াল শুক্রবার জুমার নামাজের অনেক পর হযরত (দঃ) ওহোদ পানে যাত্রা করিলেন।

● আজ ইসলাম তথা শান্তির ধর্মের প্রবর্তক আল্লার রসুলের এক অপূর্ব রূপ—তাঁহার অঙ্গে একটির উপর আর একটি লৌহ-বর্ম, হস্তে ঢাল, কোমরে জোলফাকার তরবারি, মাথায় লৌহশিরস্ত্রান। রসুলুল্লাহ (দঃ) আজ বীরবেশে রণ ক্ষেত্রের সিপাহী।

বদর-জেহাদে হযরত (দঃ) রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন; শিবিরে থাকিয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছিলেন। আজ তিনি প্রত্যক্ষভাবে রণে অবতীর্ণ হইবেন; সৈনিকদের মধ্যে থাকিয়া সেনাপতির দায়িত্ব পরিচালনা করিবেন। মোসলমান দ্বীনের খাতিরে সকল ক্ষেত্রেই ঝাপাইয়া পড়িতে সদা প্রস্তুত—হযরত (দঃ) আজ এই আদর্শ ও এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবেন। ধর্ম ও কর্ম, দ্বীন ও দুনিয়া উভয়কে সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হওয়াই ইসলামের শিক্ষা। ধর্মহীন কর্ম তাঁহার লক্ষ্য নয়, কর্মহীন ধর্মও তাঁহার আদর্শ নয়। ভোগের সুযোগে বসিয়া ত্যাগের সাধনা, উচ্চাসনের অধিকারী হইয়া কর্মীস্তরে নামিয়া আসার শিক্ষা সর্বদাই হযরত (দঃ) স্বীয় জীবনে রূপায়িত করিতেন: আজ ভয়াহব বিপদসঙ্কুল অস্ত্র ঝঙ্কারের ময়দানেও হযরত (দঃ) সেই রূপেরই রূপী। পুরা দস্তুর যোদ্ধার সাজে সজ্জিত সেনাপতি রূপে হযরত (দঃ) চলিয়াছেন নিজ দল অপেক্ষা চার গুণের অধিক সংখ্যার শত্রুকে আক্রমণ করিতে। ইসলামের নামকে মুছিয়া ফেলার উদ্দেশ্যে শত্রু ঘাড়ের উপরে আসিয়া গিয়াছে; এইরূপ মুহূর্তে উচ্চ-নিচ প্রতিটি মোসলমানকেই এই ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে—নবীজী আজ হাতে-কলমে এই শিক্ষাই দিতে চলিয়াছেন যুদ্ধক্ষেত্রে।

সৈন্য দলের যাচাই:

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রীতি ছিল, তিনি নিজ শহর হইতে কিছু দুর পথ অতিক্রম করার পরই সৈন্য দলের যাচাই করিতেন। তৎকালীন মোসলমানগণের মধ্যে দীনের খেদমত ও আল্লার রাস্তায় জেহাদ করার অপুর্ব আকাঙ্খা স্পৃহা ছিল; অনেক অনেক রুগ্ন এবং কম বয়স্ক ছেলেগণও সৈন্যদলের সঙ্গে রণাঙ্গনে ছুটিয়া চলিতেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) সৈন্য-দলের যাচাই-এর সময় অনুপযোগী লোকগণকে বুঝ-প্রবোধ দানে বাড়ী ফিরাইয়া দিতেন। বদর-জেহাদেও তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন; ওমর-পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ)কে এবং বরা ইবনে আযেব (রাঃ)কে কম বয়স্ক হওয়ার দরুন ফিরাইয়া দিয়াছিলেন।

ওহোদের জেহাদের সময়ও তিনি ঐরূপ করিলেন। শুক্রবার জুমার নামায ইত্যাদি কার্য্য হইতে অবসর হইয়া তিনি সৈন্যদল সহ মদীনা শহর হইতে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে "শায়খাইন" নামক এক স্থানে রাত্রি যাপন করিলেন এবং তথায় সৈন্যদলের যাচাই করিলেন; এই সময় তিনি ১৫ জন কম বয়স্ক ছাহাবীকে ফিরাইয়া দিলেন। ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) এবং বরা ইবনে আযেব (রাঃ) যাঁহারা বদরের জেহাদে বাছাইয়ের মধ্যে বাদ পড়িয়াছিলেন এইবারও তাঁহারা ঐরূপ কম বয়স্ক হওয়ার দরুন বাদ পড়িলেন। এতদ্ভিন্ন আরও দুইজন—রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) ও ও ছামুরা (রাঃ) ছোট গণ্য হইয়া বাদ পড়িয়াছিলেন, কিন্তু রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) চাতুরী করিলেন—তিনি নিজকে বড় দেখাইবার জন্য পায়ের অঙ্গুলির উপর ভর করিয়া দাঁড়াইলেন এবং তীর ছুড়িতে বিশেষ পটু বলিয়া সকলে তাঁহার প্রশংসা করিল। তাই

রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে জেহাদে অংশ গ্রহণ করার অনুমতি প্রদান করিলেন। তাহার সঙ্গী ছামুরা (রাঃ) এই সংবাদ শুনিয়া স্বীয় মুরব্বির নিকট বলিলেন, রাফে ইবনে খাদীজ জেহাদে যাইবার অনুমতি পাইয়াছে, আমি কেন অনুমতি পাইব না? অথচ পাছাড় ধরিলে আমি তাহাকে পরাজিত করিতে পারি। রসুলুল্লাহ (দঃ) এই সংবাদে (কৌতুক স্বরূপ) তাঁহাদের মধ্যে পাছাড় ধরাইলেন, সত্য সত্যই ছামুরা (রাঃ) রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ)কে পরাজিত করিয়া দিলেন।

এতদৃষ্টে হযরত (দঃ) তাঁহাকেও জেহাদে যাইবার অনুমতি দিলেন। ছোবহানাল্লাহ! সেই যমানায় জেহাদের প্রতি মোসলমানদের কিরূপ উৎসাহ ছিল!

মোনাফেকদলের যোগদান বর্জন:

মদীনা হইতে যাত্রাকালে হযরতের সঙ্গে এক সহস্র যোদ্ধা ছিল। তন্মধ্যে তিন শত ছিল মোনাফেক, তাহাদের সর্দার ছিল আবদুল্লাহ ইবনে-উবাই-ইবনে সলুল। মোনাফেকরা বস্তুতঃ মোসলমানদের পরম শত্রু, কিন্তু এই ক্ষেত্রে মোসলমানদের সঙ্গে না থাকিলে তাহাদের মোনাফেকী প্রকাশ পাইয়া যাওয়ার আশঙ্কা, তাই তাহারাও মোসলমানদের সঙ্গে যাত্রা করিল। কিন্তু মদীনা হইতে কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পরই তাহারা স্বীয় আভ্যন্তরীণ ভাব প্রকাশ করিয়া দিল। তাহাদের সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুলের মতামত যেহেতু মদীনা হইতে বাহির না হওয়ার অনুকূলে ছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উহার বিপরীত মদীনার বাহিরে যাইয়া সংগ্রাম পরিচালনা করাই সাব্যস্ত হয়, তাই তাহারা ছুতা ধরিল যে, যখন আমাদের পরামর্শের প্রতি লক্ষ্য করা হয় না তখন আমরা কেন প্রাণ বিসর্জন দিতে যাইব? এই বলিয়া আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল স্বীয় তিন শত মোনাফেকের দল লইয়া মোসলমানদের সঙ্গ ত্যাগ পূর্বক ফেরত চলিয়া আসিল। এমনকি তাহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইলে তাহারা এই উত্তর দিল—

لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنٰكُمْ ۔ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ .....

"যদি আমরা এই ব্যবস্থাকে যুদ্ধ মনে করিতাম তবে তোমাদের সঙ্গে থাকিতাম, (কিন্তু এইরূপ অধিক শক্তিশালী শত্রুর মোকাবিলায় রণাঙ্গনে যাওয়া নিছক আত্মহত্যায় উদ্যত হওয়ার সামিল, তাই আমরা তোমাদের সঙ্গে থাকিব না। আল্লাহ তায়ালা বলেন—) এতদিন তাহারা বাহ্যিকরূপে ঈমানের যতটুকু নিকটবর্তী মনে হইতেছিল ঐ দিন তাহাদের কার্য্যকলাপ প্রকাশ্যেও কুফুরীর নিকটবর্তী সেই তুলনায় অধিক দেখা গেল। তাহারা মুখে যতটুকু বলিয়াছে (যে, যুদ্ধ মনে করিলে তোমাদের সঙ্গে থাকিতাম) উহাও তাহাদের অন্তরে নাই।" (৪ পাঃ ৭ রুঃ)

১৪৩৯। হাদীছ :— যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ওহোদ পানে যাত্রা করিলেন, তখন মধ্যপথ হইতে তাঁহার সঙ্গস্থ কিছু লোক (মোনাফেক) ফিরিয়া আসিল। তাহাদের সম্পর্কে ছাহাবীগণের মধ্যে মতবিরোধ ঘটিল। একদল বলিলেন, তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তথা শত্রুর ন্যায় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হউক। অপর দল বলিলেন, তাহাদের বিরুদ্ধে ঐরূপ ব্যবস্থাবলম্বন করা যাইবে না। (কারণ তাহারা ত মোসলেম দলভুক্ত।) এই মতবিরোধের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া কোরআন শরীফের আয়াত নাযেল হইল—

فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا ○

"তোমরা মোনাফেকদের সম্পর্কে বিভিন্ন মতে বিভক্ত হইয়াছ কেন? অথচ আল্লাহ তায়ালা তাহাদের কার্য্য কলাপের দ্বারা পূর্বাবস্থা তথা প্রকাশ্য কুফুরীর প্রতি তাহাদের প্রত্যাবর্তন স্পষ্ট দেখাইয়া দিয়াছেন।" (৪ পাঃ ৮ রুঃ)

এতদ্ভিন্ন তাহাদের সম্পর্কে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, মদীনার অপর নাম "তায়বাহ" (—পবিত্র কারক) সে দোষী ও অপরাধীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়, যেরূপ অগ্নি রৌপ্যের ময়লাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়।

ব্যাখ্যা :—মোনাফেকদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করা—তখনকার জন্য সাময়িক সঠিক মতামতই ছিল। বস্তুতঃ ঐ মোনাফেকদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাবলম্বিত হইয়াও ছিল না, বরং তখন কোন মোনাফেকের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইত না। এতদসত্ত্বেও ঐ মত পোষণকারীদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে কটাক্ষপাত করার কারণ—ঐ মোনাফেকদের প্রতি অসহনীয় ক্রোধ প্রকাশ করা এবং মোসলমানদিগকে একটি বাস্তব তথ্যের ইঙ্গিত দেওয়া যে, মোনাফেকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাবলম্বিত না হওয়া শুধু মাত্র সাময়িক কারণাধীন, বস্তুতঃ তাহারা কঠোর ব্যবস্থার উপযোগী। মোসলমান দলভুক্ত হওয়ার ভিত্তিতে তাহাদিগকে খাতিরের পাত্র গণ্য করা নিছক ভুল।

মোনাফেকদের কার্য্যের অশুভ প্রতিক্রিয়া :

মোনাফেকগণ প্রথম হইতেই যুদ্ধে যাত্রা না করিত তাহা ভাল ছিল, কিন্তু প্রথমে যাত্রা করিয়া মধ্যপথ হইতে ফিরিয়া আসার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কোন কোন মোসলমান উপদলের উপর একটু দুর্বলতার ভাব পরিলক্ষিত হইল। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার রহমতে সেই মুহূর্তেই তাঁহাদের মনোবল দৃঢ় হইয়া গেল এবং ঐ অশুভ প্রতিক্রিয়া দূরীভূত হইয়া গেল। সেই উপদলদ্বয় ছিল বনু-সালেমা গোত্র ও বনু-হারেছা গোত্র। কোরআন শরীফেও এই ঘটনার উল্লেখ হইয়াছে।

اِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا.....

"(মোসলমানদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার কি কি বিশেষ করুণা তাহা উপলব্ধি করার জন্য স্মরণ কর—) যখন তোমাদের মধ্য হইতে দুইটি উপদল দুর্বলতার ভাবধারায় পতিত হওয়ার উপক্রম হইল (তখন আল্লাহ তায়ালা তাহাদের মনোবলকে দৃঢ় করিয়া দিলেন। এইরূপের অশুভ ভাবধারা তাহাদের ক্ষতিসাধন কিরূপে করিবে?) অথচ আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সাহায্যকারী বন্ধু। অতএব মোমেনগণকে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা স্থাপনকারী হওয়া আবশ্যক। (৪ পাঃ ৩ নুঃ)

জাবের (রাঃ) (বনু-সালেমা গোত্রের ছিলেন. তিনি) উক্ত আয়াতের উল্লেখ করিয়া বলেন, যদিও এই আয়াতের মধ্যে আমাদের একটু কলঙ্কের উল্লেখ রহিয়াছে তবুও আমরা এই আয়াতের অভিলাষী। কারণ, এই আয়াতের শেষের দিকে আল্লাহ তায়ালা আমাদের গোত্রদ্বয়কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আল্লাহ তাহাদের সাহায্যকারী বন্ধু; ইহা আমাদের জন্য চরম ও পরম সৌভাগ্য।

রণাঙ্গনের দৃশ্য:

২ বা ২।। মাইল উচ্চ মূল ওহোদ পর্বতের পাদদেশের বিস্তীর্ণ ময়দান-মধ্যে অর্দ্ধ মাইল অপেক্ষা কম উচ্চ ক্ষুদ্র আয়তনের "আইনাইন" নামক একটি ছোট পাহাড় ছিল। এই পাহাড়টির দৈর্ঘের এক দিক ওহোদ পর্বতের দিকে, কিন্তু উহা ওহোদের সঙ্গে মিলিত নহে—মধ্যভাগে বিরাট ফাঁকা। উহার অপর দিক মদীনা নগরীর দিকে; উহা ঘেঁষিয়া একটি অপ্রশস্ত পথ; ঐ পথের পার্শেই (তৎকালে একটি) পার্বত্য প্রণালী বা খাল-বিশেষ ছিল। সেই প্রণালীটিই উক্ত এলাকাকে মদীনার মূল ভূ-খণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। এই আইনাইন পাহাড়টির উভয় পার্শে বিস্তীর্ণ ময়দান। এক পার্শের ময়দানে তিন হাজার কাফের বাহিনী দিন কয়েক পূর্ব হইতেই অবস্থান গাড়িয়া রহিয়াছিল। তাহাদের বামে ওহোদ পর্বত, ডানে পার্বত্য প্রণালী ও মদীনার দিক, পেছনে মক্কা দিকের পথের এলাকা, সম্মুখে আইনাইন পাহাড়। মোসলেম বাহিনী উক্ত পাহাড়ের অপর পার্শস্থ ময়দানে উপস্থিত হইল; তাহাদের সম্মুখে ঐ পাহাড়, ডানে ওহোদ পর্বত, বামে পার্বত্য প্রণালী।

এই আইনাইন পাহাড়ের দৈর্ঘের পূর্ব মাথা এবং ওহোদ পর্বতের মধ্যবর্তী যে সুপ্রশস্ত ফাঁকা রহিয়াছে এই ফাঁকা পথেই মোসলেম বাহিনী অগ্রসর হইয়া আইনাইন পাহাড়ের অপর পার্শে অবস্থানরত কাফের বাহিনীর উপর আক্রমণ চালাইবে—এই পরিকল্পনা হযরত (দঃ) স্থির করিলেন। কারণ, পাহাড়টির অপরদিকে ত অপ্রশস্ত পথ এবং পথের সংলগ্নেই প্রণালী বা খালের খাদ। কাফের বাহিনীর সম্মুখেও এই একই পরিকল্পনা,

অতএব আইনাইন পাহাড়ের মাথা এবং ওহোদ পাহাড় উভয়ের মধ্যবর্তী সুপ্রশস্ত ফাঁকা জায়গাটিই হইবে যুদ্ধের মূল ক্ষেত্র। প্রত্যেক পক্ষই ঐ পথে অগ্রসর হইয়া অপর পক্ষের উপর আক্রমণ করিবে; সুতরাং উভয় পক্ষের অক্রমণ ও প্রতিরোধ ঐ জায়গায়ই হইবে।

আইনাইন পাহাড়ের অপর তথা মদিনার দিকের মাথায়ও উহার উভয় পার্শ্বের যোগ-সূত্র পথ ছিল কিন্তু তাহা প্রণালীর গর্তের দরুন অপ্রশস্ত। এই পথটি কাফের বাহিনীর জন্য বিশেষ সুযোগের বস্তু; কারণ তাহাদের সংখ্যা অনেক; তাহারা মূল যুদ্ধক্ষেত্রে পুরাদমে যুদ্ধ চালাইয়াও বাহিনীর বিশেষ অংশকে এই পথে অগ্রসর করিয়া পাহাড়ের অপর পার্শস্থ মোসলেম বাহিনীর উপর পেছন দিক হইতে আক্রমণের জন্য নিয়োগ করিতে পারে। মোসলমানদের জন্য এই পথের উক্ত সুযোগ বর্তমান, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অল্প—তিন হাজারের সম্মুখে মাত্র সাত শত। তাহারা বিভক্ত হইয়া যুদ্ধ চালাইতে সক্ষম হইবে না, কিন্তু এই দিকের আক্রমণ রোধের ব্যবস্থা তাহাদিগকে অবশ্যই করিতে হইবে। নতুবা মুহূর্তের মধ্যে তাহারা সম্মুখ ও পেছন উভয় দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া পড়িবে। সুতরাং এই পথে কাফেরদের জন্য আক্রমণের সুযোগ, আর মোসলেম বাহিনীর জন্য আত্মরক্ষায় প্রতিরোধ ব্যবস্থার প্রয়োজন।

কাফেররা তাহাদের সুযোগ হইতে বে-খবর ছিল না, তাই তাহারা বীরবর খালেদ ইবনে ওলীদের (তিনি তখন মোসলমান ছিলেন না) অধীনে দুইশত অশ্বারোহী বীর সেনানী ঐ পথে অগ্রসর হওয়া সুযোগ অপেক্ষায় মোতায়েন রাখিয়া মূল ক্ষেত্রে যুদ্ধ আরম্ভের প্রস্তুতি নিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) আত্মরক্ষার প্রয়োজন হইতে অচেতন ছিলেন না, তাই তিনি আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অধীনে পঞ্চাশ জনের একটি তীরান্দাজ—ধানুকী বাহিনী ঐ পাহাড়ের মাথায় এই পথে নিয়োগ করিলেন। ধানুকী বাহিনীকে আরবী ভাষায় "রোমাত" বলা হয়, এই সূত্রেই বর্তমানে আইনাইন পাহাড়কে "জাবালে রোমাত"—ধানুকীদের পাহাড় বলা হয়। ঐ পথটি মোসলেম বাহিনীর পক্ষে অতি ভয়াবহ বিপদের বাহনরূপে থাকিলেও পূর্বেই উল্লেখ হইয়াছে যে, পথটি অপ্রশস্ত ছিল; অতএব ঐ পথে অল্প সংখ্যক লোকের পক্ষে অধিক সংখ্যককে প্রতিরোধ করা সহজ-সাধ্য ছিল। তাই দুইশত শত্রু সেনার প্রতিরোধে পঞ্চাশ জন যথেষ্ট ছিল। ঐ ধানুকী বাহিনীর প্রতি হযরতের এই কঠোর আদেশ রহিল যে, আমরা তথা মূল বাহিনী জয়ী হই বা পরাজিত হই—কোন অবস্থাতেই আমার ভিন্ন নির্দেশ ছাড়া তোমরা এই স্থান ত্যাগ করিবে না।

এইরূপে সামান্য সংখ্যক লোক দ্বারা পেছন দিকের পথটি বন্ধ করিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) পেছন দিক হইতে নিশ্চিন্ত অবস্থায় সম্মুখ দিকে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া অগ্রসর হইলেন। তাঁহার এই বিচক্ষণতাপূর্ণ সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাকে উল্লেখযোগ্যরূপে কোরআন শরীফের নিম্ন আয়াতে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ......

"আপনি স্বীয় পরিবারবর্গ ছাড়িয়া প্রভাত বেলায় যখন মোসলেম সৈন্যদলের জন্য বিশেষ বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট করিতে লাগিলেন (তখনকার দৃশ্যটি একটি স্মরণীয় দৃশ্য।) আল্লাহ তায়ালা সব কিছুই শোনেন এবং জানেন।" (৪ পারা ৩ রুকু)

উভয় পক্ষের সৈন্য সংখ্যা:

মোসলমানদের পক্ষে মদীনা হইতে এক সহস্র সৈন্য যাত্রা করিয়াছিল, মধ্যপথ হইতে মোনাফেক তিন শত চলিয়া আসিয়াছিল, তাই মোসলমানদের সৈন্য ছিল সাত শত; তন্মধ্যে নগণ্য সংখ্যক ছাড়া কাহারও সঙ্গে ঘোড়া ছিল না। কাফেরদের সৈন্য ছিল তিন হাজার; তন্মধ্যে দুই শত অশ্বারোহী ছিল।

যুদ্ধ আরম্ভ ও মোসলমানদের বিজয় দৃশ্য:

সর্বপ্রথম কাফেরদের পক্ষে তাল্‌হা নামক পতাকাবাহী ব্যক্তি অগ্রগামী হইল এবং মোসলমানদের প্রতি উপহাস স্বরূপ এই বলিয়া কটাক্ষ করিল যে, তোমাদের মধ্যে কে আছে যে আমাকে (হত্যা করিয়া সত্বর আমাকে) নরকে পৌঁছাইয়া দেয় বা আমার হাতে (নিহত হইয়া) সত্বর স্বর্গে পৌঁছিয়া যায়। তাহার এই আহ্বানে আলী (রা:) ময়দানে অবতরণ করিলেন এবং বলিলেন, আমি আছি। এই বলিয়া তিনি তরবারির এক আঘাতে তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। অত:পর নিহত তালহার পুত্র ওসমান পতাকা হাতে লইয়া অগ্রসর হইল। হামযা (রা:) তৎক্ষণাৎ অগ্রগামী হইয়া তাহার কাঁধের উপর তরবারির এরূপ আঘাত করিলেন যে, তরবারি তাহার কোমর পর্য্যন্ত নামিয়া আসিল।

অত:পর উভয় পক্ষ হইতে ব্যাপক আক্রমণ আরম্ভ হইল, মোসলমানগণ বীরত্বের সহিত অগ্রসর হইতে ছিলেন। কাফেরেদের পক্ষে পর পর লাশ পড়িতেছিল, এমনকি তাহারা পশ্চাদপদ হইতে বাধ্য হইল। যেই নারীগণ সৈন্য দলকে অগ্রগামী হওয়ায় উৎসাহিত করিতেছিল তাহারা পর্য্যন্ত পলায়নে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। এইরূপে মোসলমানগণ স্বীয় অবস্থান ঘাটি হইতে অগ্রসর হইয়া শত্রু সেনার অবস্থান ঘাটিতে আসিয়া পড়িলেন; শত্রুপক্ষ সকলেই পলায়নে ব্যস্ত, কিন্তু তাহাদের অশ্বারোহী দল খালেদ ইবনে অলীদের অধীনে সুযোগের সন্ধানে ছিল—তাহারা মোসলমানদের পেছনের পথ বাধামুক্ত হওয়ার অপেক্ষায় ছিল। হঠাৎ যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়া গেল; জয়-পরাজয়ে পরিবর্তন ঘটিল।

মোসলমানদের পক্ষে পরাজয়ের দৃশ্য ও উহার কারণ:

পুর্বেই বলা হইয়াছে রসুলুল্লাহ (দ:) পেছন দিক হইতে আক্রমণের সুযোগ পাওয়ার পথের উপর আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অধিনায়কত্বে পঞ্চাশ

জন তীরান্দাজ সৈন্য মোতায়েন করিয়া ছিলেন এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাহাদের প্রতি তাঁহার স্পষ্ট নির্দেশ ছিল যে, আমরা জয়ী হই বা পরাজিত—তোমরা কোন অবস্থাতেই স্থান ত্যাগ করিবে না। এই ব্যবস্থার পর রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং রণাঙ্গনে উপস্থিত থাকিয়া সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইলেন। মোসলমানদের পক্ষে স্পষ্টরূপে জয় পরিলক্ষিত হইতেছিল, তাঁহারা পেছন দিক হইতে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলেন এবং শত্রু সেনাদলকে তাড়া করিয়া যাইতে ছিলেন।

পেছন দিকে অবস্থিত তীরান্দাজ বাহিনী ভাবিলেন, যুদ্ধের অবসান প্রায়; শত্রুদল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া রণাঙ্গন হইতে পলায়নে বাধ্য হইয়াছে। আমাদের সৈন্যগণ তাহাদিগকে তাড়া করিতে ব্যস্ত রহিয়াছেন। আমরা এখন পর্য্যন্ত কোন কাজ করার সুযোগ পাই নাই। এখন আমাদের সম্মুখে একটি কাজের সুযোগ দেখা যাইতেছে—উহা হইল গণিমতের মাল তথা শত্রুগণ কর্তৃক রণাঙ্গনে পরিত্যক্ত ধন-সম্পদ, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি যাহা বাইতুল-মাল বা জাতীয় ধন-ভাণ্ডারের সম্পদ হইবে, এই সবকে একত্রিত করিয়া উহার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা; ইহাও একটি জাতীয় খেদমত, তাই আমরা বর্তমান সুযোগে এই কার্য্যটি সমাধা করি। এই ভাবিয়া তাঁহারা গণিমতের মাল সংগ্রহ ও সংরক্ষণে চলিয়া আসিলেন।

পাঠকবর্গ; এখানে একটি বিষয় বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবেন যে, গণিমতের মাল কোন অবস্থাতেই কাহারও ব্যক্তিগত সম্পদ পরিগণিত হয় না। যে বা যাহারা উহা হস্তগত করিবে, উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে তাহার ব্যক্তিগত কোন প্রকার অধিকার উহার উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে না। এমনকি ঐ ব্যক্তি অন্যান্য মোজাহেদগণের তুলনায় কোন প্রকার আধিক্যের ভাগী হইবে না। ইহা শরীয়তের একটি সুস্পষ্ট বিধান। এমতাবস্থায় ঐ ছাহাবীগণের উক্ত কার্য্যকে জাতীয় খেদমতে অংশগ্রহণ করা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? এই কার্য্যকে উক্ত ছাহাবীগণের পক্ষে লালসা বা ধন-সম্পদের স্পৃহা গণ্য করা যাইতে পারে না। কারণ, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির স্থলেই লালসা ও স্পৃহার উৎপত্তি বলা যায়, অথচ এইস্থলে ব্যক্তিগত বিশেষ স্বার্থের কোন সম্পর্ক ও সুযোগ ছিলই না।

অবশ্য এইস্থলে তাঁহাদের অন্য একটি মারাত্মক ভুল হইতেছিল যে, তাঁহারা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ধারণার বশীভূত হইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি সুস্পষ্ট নির্দেশ বিরোধী কার্য্য করিতে উদ্যত হইলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে নির্দেশ দিয়াছিলেন, আমরা জয়ী হই বা পরাজিত হই আমার পুনঃ আদেশ ব্যতিরেকে তোমরা এই স্থান ত্যাগ করিবে না। কিন্তু তাঁহারা নিজ বিবেকে যুদ্ধের অবসান ধারণা করিয়া হযরতের পুনঃ আদেশ ব্যতিরেকেই ঐ স্থান ত্যাগ করিলেন। এমনকি তাঁহাদের অধিনায়ক আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মতের বিরুদ্ধে তাঁহারা উহা করিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) তাহাদিগকে হযরতের সুস্পষ্ট নির্দেশ স্মরণও

করাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা নিজ বিবেকের যুক্তি দেখাইয়া বলিলেন, এই নির্দেশ প্রবর্তিত থাকার পরিস্থিতির অবসান ঘটিয়াছে।

এইরূপে নিজস্ব ধারণার বশে রসুলের সুস্পষ্ট নির্দেশ বিরোধী কার্য্য করা মারাত্মক ভুল ছিল এবং এই ভুলের সূচনায় আল্লার রসুলের বিরুদ্ধাচরণ মনোভাব বা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির মনোবৃত্তি ছিল না, ছিল একমাত্র জাতীয় খেদমতে অংশ-গ্রহণ করার অভিলাস, অবশ্য এই অভিলাসটি গণিমতের মাল তথা জাগতিক বস্তু সম্পর্কীয় ছিল।

জাতীয় খেদমতে অংশগ্রহণ করার মনোবৃত্তি একটি উত্তম বস্তু, কিন্তু যেহেতু এস্থলে এই মনোবৃত্তি আল্লার রসুলের নির্দেশের পরিপন্থি কার্য্য টানিয়া আনে, তাই ইহা আল্লাহ তায়ালার নিকট অসন্তুষ্টি ও ক্রোধের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। যদ্দরুন আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফের একটি আয়াতে এই ভুল ও ত্রুটি সংঘটক ছাহাবীগণকে তাঁহাদের কার্য্যের বাহ্যিক দিক তথা জাগতিক বস্তু—গণিমতের মালের সম্পর্ক উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষপাত করণ পূর্ব্বক বলিয়াছেন,—"তোমাদের মধ্যে কাহারও ইচ্ছা ও ধাবন দুনিয়ার প্রতি হইল।" অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্বার্থ ও লালসায় না হইয়া জাতীয় স্বার্থে হইলেও তাহারা দুনিয়া তথা জাগতিক বস্তুর প্রতি ধাবমান হইল। এই কার্য্যটা তত বড় অপরাধমূলক না হইলেও ঐ ক্ষেত্রে তাঁহারা অন্য একটা বড় অপরাধ করিয়া ছিলেন যে, রসুলের স্পষ্ট আদেশ বিদ্যমান থাকাবস্থায় নিজ বিবেক খাটাইয়া উহার বিপরীত কাজ তাঁহারা করিয়াছিলেন। ক্ষেত্র বিশেষে কোন ছাহাবীর দ্বারা এই শ্রেণীর অপরাধ হওয়া বিচিত্র নহে; কারণ তাহারা নিষ্পাপ ছিলেন না। তাঁহাদের এই অপরাধটি নিতান্তই গুরুতর ছিল যদ্দরুণ তাঁহাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার ভয়ঙ্কর ক্রোধ সাময়িকরূপে সৃষ্টি হইয়াছিল। পবিত্র কোরআনে এই গুরুতর অপরাধটির বর্ণনা-সংলগ্নেই ঐ জাগতিক বস্তুর প্রতি ধাবমান হওয়ার বিষয়টাও উল্লেখ হইয়াছে। এই উল্লেখের তাৎপর্য্য এই যে, অনেক ক্ষেত্রে ক্রোধের প্রবাহে বর্ণিত বর্ণনায় গুরুতর অপরাধের সহিত লঘু অপরাধ, এমনকি বস্তুত: যাহা অপরাধ নয় শুধু বাহ্যিক দৃশ্যের মামুলী সূত্র ধরিয়া উহাকেও অপরাধ গণনার মধ্যে শামিল করিয়া দেওয়া হয়। বিশেষত: অপরাধকারী যদি এরূপ মর্য্যাদাবান হন যে, ক্রোধজনিত কাজ তাহার দ্বারা না হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল; সে যদি তাহা করে তবে সে ক্ষেত্রে রাগ ও ক্রোধের বিকাশে ক্ষুদ্র অপরাধও বড়রূপে ব্যক্ত হইয়া থাকে। পবিত্র কোরআনে এইরূপে বর্ণনার নজীর আরও বিদ্যমান আছে। যেমন -আদম আলাইহেচ্ছালামের গন্দম খাওয়ার ঘটনায় রাগ প্রকাশে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, وعصى ادم ربه فغوى যাহার শাব্দিক অর্থ হইল—"আদম আল্লার নাফরমানী করিয়াছেন ফলে ভ্রষ্ট হইয়াছেন। অথচ নবী নিঃষ্পাপ হইয়া থাকেন। তদ্রূপ ইউনুস আলাইহেচ্ছালাম সম্পর্কে আছে—

وَذَا النُّونِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ

"মাছের ঘটনার নবী—যখন তিনি (তাঁহার জন্য নির্দ্ধারিত কর্মস্থল হইতে) রাগ হইয়া চলিয়া গেলেন; তাঁহার যেন ধারণা ছিল—আমি তাহাকে ধরিতে সক্ষম হইব না।" অথচ আল্লাহ সম্পর্কে এইরূপ ধারণা নিঃষ্পাপ নবীর দ্বারা হইতে পারে না। কিন্তু আল্লার অনুমতি ব্যতিরেকে লোকদের প্রতি রাগ বশতঃ কর্মস্থল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়াতে আল্লাহ তায়ালা ক্রোধান্বিত হইয়া উক্ত ভাষা ও বাক্য প্রয়োগ করিরাছেন।

পাত্র ও ক্ষেত্রবিশেষে ক্ষুদ্র অন্যায় বড় অন্যায়রূপে গণ্য হওয়া এবং সেই রাগে কঠোর ভাষা ব্যবহৃত হওয়া একটি সাধারণ নিয়ম। আদম আলাইহেচ্ছালামের ঘটনায় উপরোল্লিখিত আয়াতের কঠোর ভাষা প্রয়োগ সম্পর্কে মাওলানা রুমী এই তথ্যই একটি সুন্দর দৃষ্টান্তে বুঝাইয়াছেন।

گرچہ یک موبود گناہ کو جستہ بود - لیک آن مودرد و دیدہ رستہ بود
بود آدم دیدۂ نور قدیم — موئے در دیدہ بود کوہ عظیم

অর্থ—যদিও আদম আলাইহেচ্ছালামের অন্যায়টা চুল পরিমাণ মাত্র ছিল* কিন্তু সেই চুল চোখে পতিত হইয়াছিল। আদম আলাইহেচ্ছালামের মর্য্যাদা আল্লাহ তায়ালার নিকট চোখ তুল্য; চোখে চুলও বড় পাহাড় বোধ হইয়া থাকে।

ওহোদ-জেহাদের আলোচ্য ঘটনায় গণিমতের মাল সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রতি কতিপয় ছাহাবীর ছুটিয়া যাওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা যে মন্তব্য ও কটাক্ষ করিয়াছেন তাহাও উল্লিখিত দর্শন দৃষ্টিতেই দেখিতে হইবে। দুনিয়ার মোহ এবং ধনের লালসা অধিক হওয়া—এই গ্লানি কোন একজন ছাহাবীর মধ্যেও বিন্দুমাত্র পাওয়া যাইত না। মোসলমানদের ঈমান ও বিশ্বাস ইহাই এবং ইহাই বাস্তব ও সত্য বটে।

সতর্কবাণী:— কোন কোন প্রসংশনীয় লেখক নবীজীর ইতিহাস রচনায় অতুলনীয় সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। কিন্তু সর্বাঙ্গীন ইসলামী জ্ঞানের অভাবে অনেক আছাড়ও খাইয়াছেন। যেমন—ওহোদ-জেহাদের আলোচ্য ঘটনায় উক্ত ছাহাবীগণের প্রতি এমন একটা কদর্য্য উক্তি করিয়াছেন যাহার উদ্ধৃতিতেও কলম থামিয়া যায়। উল্লিখিত ঘটনায় জড়িত ৩৭/৩৮ জন ছাহাবীর ঐ ক্ষেত্রে ত্রুটি অবশ্যই হইয়াছিল; যেই ত্রুটির মাশুল সকলকে ভূগিতে হইয়াছিল এবং আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত তাঁহাদের ত্রুটির বর্ণনাও দিয়াছেন; অবশ্য তাঁহাদের প্রতি প্রীতি প্রকাশে বলিয়াও দিয়াছেন—ولقد عفا عنكم "শপথ করিয়া বলিতেছি, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন।"

কিন্তু তাঁহাদের ত্রুটি ঐ গ্লানি ছিল না যাহা উক্ত লেখক আবিষ্কার করিয়াছেন। লেখকের ভাষায়—"যুদ্ধ জয় অপেক্ষা লুণ্ঠনের লোভই ছিল অনেকের মধ্যে প্রবল। হযরতের

---

* কারণ, আল্লাহ তায়ালাই বলিয়াছেন, আদম ভুলিয়া গিয়াছিল; ইচ্ছাকৃত সে নাফরমানী করিয়াছিল না (ছুরা তা'হা দ্রষ্টব্য) আর ভুল চুক ত ক্ষমার্হ।

কড়া হুকুম সত্ত্বেও তীরন্দাজদিগের স্থান ত্যাগই তাহার প্রমাণ।" কিন্তু উল্লিখিত গ্লানি কোছাহাবীর চরিত্রেও ছিল না—ইহাই সত্য; সত্যকে প্রকাশ করিয়া দেওয়াই আমাদের কর্তব্য।

একটি ভুল ঃ—ইসলামী জেহাদে গণিমত অর্জন ও গণিমতের মাল সংগ্রহকে বাঙ্গালী পণ্ডিতগণ "লুণ্ঠন" শব্দে ব্যক্ত করেন; ইহা বিশ্রী ও কুৎসিত ভাষান্তর। "লুণ্ঠন" শব্দটির আভিধানিক অর্থের প্রশস্ততার পরিমাপের প্রয়োজন নাই; সাধারণ্যে এই শব্দটি যে কাজকে বুঝায় উহা যে, একটা মন্দ ও অবৈধ কাজ তাহা সুস্পষ্ট। অথচ গণিমত অর্জন ও সংগ্রহকরণ একটি বৈধ কাজ। পূর্ববর্তী নবীগণের শরীয়তেও ইহা বৈধ ছিল। অবশ্য তাঁহাদের শরীয়তে উহা ভোগ করার অনুমতি ছিল না; বিধান এই ছিল যে, গণিমতের সমস্ত মাল একত্রিত করিয়া রাখা হইবে; উক্ত জেহাদ আল্লাহ তায়ালার নিকট কবুল হইলে আসমান হইতে অগ্নিশিখা আসিয়া ঐ মাল ভস্ম করিয়া যাইবে, কবুল না হইলে আগুন আসিবে না। তখন কর্মকর্তা খোঁজ করিবেন যে, জেহাদ কি দোষে কবুল হইল না। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—أحلت لى الغنائم "আমার উম্মতের বৈশিষ্ট্য যে, গণিমতের মাল তাহাদিগকে ভোগ করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।" স্বয়ং হযরত (দঃ) গণিমতের অংশগ্রহণ করিয়া থাকিতেন। নবী (দঃ) কি লুটের মাল গ্রহণকারী ছিলেন? গণিমতের মালের ভাগ-বন্টন এবং উহা ব্যয়ের পাত্র নির্দ্ধারণের বিধান পবিত্র কোরআনে বর্ণিত রহিয়াছে: দশম পারার আরম্ভ এবং নবম পারার ছুরা আনফালের আরম্ভ দ্রষ্টব্য।

অবশ্য গণিমতের কোন প্রতিশব্দ বাংলা ভাষায় নাই। কারণ, গণিমত হইল ইসলামের একটি বিশেষ বস্তু, আর ইসলামের ভাষা আরবী। এই ক্ষেত্রে গণিমত শব্দের ভাষান্তর না করিয়া উহার মর্ম বুঝাইয়া দিবে যে, ইসলামী জেহাদে শরীয়তের অধীনে শত্রুপক্ষের যে ধন-সম্পদ হস্তগত হয় উহাকে গণিমত বলে—অর্থাৎ "যুদ্ধ-লব্ধ মাল-সম্পদ"। বর্তমান যুগেও যুদ্ধে বিজয়ী পক্ষ সমরক্ষেত্রে শত্রুর পরিত্যক্ত মাল সম্পদ হস্তগতকারী হইয়া থাকে—ইহাকে লুণ্ঠন করা কেহই বলে না।

তীরান্দাজ বাহিনীর সৈন্যগণ যখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নির্দেশিত স্থান ত্যাগ করায় উদ্যত হইলেন, তখন তাঁহাদের অধিনায়ক আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) তাঁহাদিগকে রসুলুল্লার নির্দেশ স্মরণ করাইয়া বাধা দিলেন, কিন্তু তাহাদের অধিক সংখ্যক পূর্বালোচিত যুক্তি বলে সেই বাধা খণ্ডন পূর্বক তথা হইতে চলিয়া গেলেন। শুধুমাত্র অধিনায়ক আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) এবং তাঁহার সঙ্গী ১১।১২ জন ছাহাবী তথায় অবস্থিত রহিলেন।

অদৃষ্টের পরিহাস। মুহূর্তের মধ্যে উহাই ঘটিয়া বসিল যাহার আশঙ্কায় হযরত (দঃ) এই স্থানে তীরান্দাজ বাহিনী মোতায়েন করিয়াছিলেন। শত্রুদলের অন্যতম বীর পুরুষ অশ্বারোহী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক খালেদ ইবনে অলীদ মোসলমানদের পেছন দিকের ঐ রাস্তায় সুযোগ লাভের অপেক্ষায় ছিল, ঐ রাস্তায় মোসলমানদের শক্তির স্বল্পতা এবং

সৈন্য সংখ্যার নগণ্যতা লক্ষ্য করার সঙ্গে সঙ্গে দুই শত অশ্বারোহী সৈন্য তৎসঙ্গে আরও এক শত সৈন্য লইয়া অতি দ্রুতবেগে ঐ দিকে ধাবিত হইল এবং হঠাৎ ভীষণ ভাবে আক্রমণ চালাইয়া দিল। তিন শত শত্রু সেনার মোকাবিলায় ১১।১২ জন সৈন্য কি করিতে পারে? তাঁহারা আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত পশ্চাদপদ হইলেন না, কিন্তু ঐ দুর্ধর্ষ বাহিনীকে প্রতিরোধ করা তাঁরাদের পক্ষে সম্ভব হইল না। অধিনায়ক আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) সহ সকলেই শাহাদৎ বরণ করিলেন।

খালেদ-বাহিনীর সম্মুখের বাধার অবসান হইল, তাহারা সরাসরি মোসলমানদের মূলবাহিনীর উপর পেছন দিক হইতে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইল। মোসলমানগণ পেছন দিকের অপ্রত্যাশিত আক্রমণে এমন বিশৃঙ্খলায় পতিত হইলেন যে, অস্থিরতার মধ্যে নিজেদের হাতে নিজেদের লোক শহীদ হওয়ার ঘটনা পর্য্যন্ত ঘটিল। হোজায়ফা (রাঃ) ছাহাবীর পিতা ইয়ামান (রাঃ) সেই বিশৃঙ্খলার মধ্যে মোসলমানদের হাতেই শহীদ হইলেন। হোজায়ফা (রাঃ) "আমার পিতা, আমার পিতা" চীৎকার করিলেন, কিন্তু চীৎকার কার্য্যকর হওয়ার সুযোগ ছিল না।

মোসলমানদের পেছন দিকে খালেদ বাহিনীর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে পলায়নরত শত্রুদলের মূলবাহিনী ফিরিয়া দাঁড়াইল। এখন মোসলমানগণ শত্রুদের কবলে বেষ্টিত হইয়া পড়িলেন এবং চতুর্দিক হইতে আক্রান্ত হইলেন। শত্রু পক্ষের লক্ষ্য রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি নিবদ্ধ ছিল, তাহারা সাধারণ সৈন্য দলকে ভেদ করিয়া রসুলুল্লার দিকে অগ্রসর হইতে সচেষ্ট ছিল। উপস্থিত ছাহাবীগণ তাঁহার সম্মুখে সুদৃঢ় রক্ষাব্যূহ সৃষ্টি করিলেন। আবু দুজানা (রাঃ) স্বীয় পৃষ্ঠকে, তালহা (রাঃ) স্বীয় বাহুকে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিরাপত্তার জন্য ঢালরূপে ব্যবহার করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) অতি অল্প সংখ্যক ছাহাবীগণের সঙ্গে ছিলেন। শত্রুদের প্রবল আক্রমণ একমাত্র তাঁহার প্রতি— এমতাবস্থায় রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, من يرد هم عنى وهو رفيقى فى الجنة "আমার হইতে শত্রুগণকে প্রতিহত করিয়া বেহেশতের মধ্যে আমার সঙ্গ লাভের প্রয়াসী কে আছে? মদীনাবাসী সাত জন ছাহাবী তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই হযরতের নিরাপত্তার জন্য স্বীয় জীবন উৎসর্গ করতঃ শাহাদৎ বরণ করিলেন। (মোসলেম)

তাঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম সাড়া দিয়াছিলেন যিয়াদ ইবনে ছাকান (রাঃ); তিনি ভীষণ আহত—এমতাবস্থায় হযরত (দঃ) তাঁহাকে উঠাইয়া আনার আদেশ করিলেন। তাঁহাকে হযরতের সম্মুখে ধরাশায়ী অবস্থায় রাখা হইলে তিনি স্বীয় মুখমণ্ডল রসুলুল্লার চরণে রাখিয়া দিলেন এবং চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন।

যুদ্ধের এই স্তরে হাম্‌যা (রাঃ) এবং কতিপয় বড় বড় ছাহাবীসহ সত্তর জন ছাহাবী শাহাদৎ বরণ করিলেন। তন্মধ্যে দশ জন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিরাপত্তার জন্য তাঁহার নিকটবর্তী শাহাদৎ বরণ করেন। এতদসত্ত্বেও হযরত (দঃ) ঐ সময়

ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হন, এমনকি তিনি একটি গর্তের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। যদ্দরুণ তিনি দৃষ্টির আড়ালে হইয়া গেলেন। এদিকে হযরতের নিকটবর্তী যে দশ জন ছাহাবী শহীদ হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে পতাকাবাহী মোছয়া'ব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) ছিলেন। আমর ইবনে কমিয়া নামক কাফের তাঁহাকে শহীদ করিয়াছিল। তাঁহার আকৃতি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আকৃতির সদৃশ ছিল; তাই ঐ কাফের মনে করিল, সে হযরত (দঃ)কে শহীদ করিয়াছে। লোকদের মধ্যেও সে এই ভুল কথাই প্রচার করিয়া বেড়াইল, এতদ্ভিন্ন ইবলিশ শয়তানও চিৎকার করিয়া এই মিথ্যা খবর প্রচার করিল যে, قتل محمد "মোহাম্মদ নিহত হইয়াছে।"

পরিস্থিতির ভয়াবহতা, তদুপরি এই দুঃসংবাদ মোসলমানগণকে হতাশ ও হুশহারা করিয়া ফেলিল। তাঁহারা দিশাহারা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ন্যায় লৌহ মানব পর্য্যন্ত হাত পা ছাড়িয়া হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। কেহ কেহ পাহাড়ী এলাকার দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম গর্তে পতিতাবস্থায় الى عباد الله "আল্লার বন্দাগণ! আমার নিকট আস" বলিয়া ডাকিতে ছিলেন, কিন্তু সন্ত্রস্ততার অবস্থায় মোসলমানদের কর্ণ পর্য্যন্ত এই শব্দ পৌছার সম্ভাবনা ছিল না। মোসলমানদের মধ্যে কাহারও কাহারও অবস্থা ইহার বিপরীতও ছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) শহীদ হওয়ার গুজবে তাঁহারা শত্রুর মোকাবিলায় অধিক তৎপর হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা ভাবিলেন এবং প্রকাশও করিলেন যে, রসুলুল্লার পরে আমাদের জীবিত থাকার আবশ্যক কি? তিনি যেই পথে প্রাণ দিয়াছেন আমরাও সেই পথেই চলিয়া যাই; আনাছ ইবনে নজর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নাম তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তিনি ওমর (রাঃ)কে পর্য্যন্ত তিরস্কার করতঃ ঐ কথা বলিয়া শত্রু সেনার ভিতরে প্রবেশ পূর্বক জেহাদে শহীদ হইলেন। তাঁহার শরীরে আশিটির অধিক আঘাত লাগিয়াছিল, এমনকি তাঁহার সেনাক্ত করা অসম্ভব ছিল। তাঁহার ভগ্নি তাঁহার অঙ্গুলির একটি নিদর্শন দেখিয়া সেনাক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

এই অবস্থার পর কায়া'ব ইবনে মালেক (রাঃ) নামক ছাহাবী রসুলুল্লাহ (দঃ)কে জীবিতাবস্থায় সর্বাগ্রে দেখিতে পান। দেখামাত্র তিনি "এইত রসুলুল্লাহ" বলিয়া চীৎকার করিলেন। তাঁহার এই চীৎকার ছাহাবীদের মধ্যে বিজলীর ন্যায় দ্রুত ছড়াইয়া পড়িল। হুশহারা বিক্ষিপ্ত মোসলমানগণ চতুর্দিক হইতে দৌড়িয়া আসিলেন—যেরূপ মাতৃহারা গোশাবক মায়ের ডাকে ছুটিয়া আসে।

অতঃপর কাফেররা রসুলুল্লাহ (দঃ)কে লক্ষ্য করিয়া আক্রমণ চালায় বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কাফের শত্রু সৈন্য অগ্রসর না হইয়া রণাঙ্গন হইতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে যাত্রা করিল। রণাঙ্গন পরিত্যাগের প্রাক্কালে তাহাদের দলপতি আবু সুফিয়ান শুধু এতটুকু বলিয়া গেল, আজিকার দিন বদরের দিনের প্রতিশোধ।

অতঃপর রণাঙ্গনে শুধু মোসলমানগণই থাকিলেন, শত্রু সেনা কাফেররা রণাঙ্গন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। উল্লিখিত ঘটনা প্রবাহের বিভিন্ন বিষয়ের আয়াত ও হাদীছ যাহা বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন উহার অনুবাদ এই—

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ حَتّٰى اِذَا فَشِلْتُمْ.....

অর্থ—নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা স্বীয় প্রতিশ্রুতি (যে, তিনি মোসলমানদিগকে সাহায্য দান করিবেন উহা ওহোদের রণাঙ্গনেও) কার্য্যকরী ও বাস্তবে রূপায়িত করিয়াছিলেন—যখন তোমরা আল্লাহ তায়ালার সাহায্য-সহায়তায় শত্রু সেনা কাফেরদের বিলুপ্তি সাধন করিয়া যাইতেছিলে। অতঃপর যখন তোমাদের মধ্যে (রসুলুল্লার আদেশ সম্পর্কে) মত বিরোধের সৃষ্টি হইল এবং তোমরা (তথা তোমাদের একাংশ রসুলুল্লার) আদেশ বিরোধী কার্য্যে লিপ্ত হইল (তখন আর ঐ অবস্থা স্থায়ী রহিল না, বরং অবস্থা বিপরীত রূপ ধারণ করিল।) অথচ এইমাত্র আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে তোমাদের মনোবাঞ্ছা-পূরণ দৃশ্য দেখাইয়া ছিলেন। তোমাদের মধ্যে একদল লোকের ইচ্ছা ছিল জাগতিক বস্তু (সম্পর্কীয় কার্য্য; যদ্দরুন তাহারা মারাত্মক ভুলে পতিত হইয়াছিল)। পক্ষান্তরে তোমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক এইরূপও ছিলেন যাঁহারা শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত আখেরাতের (উন্নতি তথা রসুলের আদেশের প্রতি লক্ষ্য ও দৃষ্টি নিবদ্ধকারী ছিলেন। (বস্তুতঃ সকলেরই ঐরূপ করা কর্তব্য ছিল; এই কর্তব্যের ত্রুটিই বিপদের মূল কারণ। তোমাদের উক্ত ত্রুটিজনিত কার্য্যের) পরেই আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে শত্রু বাহিনীর দিক হইতে ফিরাইয়া দিলেন। (তোমরা শত্রুদের পেছনে ধাওয়া করিয়া শত্রুদেরকে তাড়া করিয়া নিয়া যাইতেছিলে; শত্রুদল পরাজিতরূপে পলায়নরত ছিল। এখন উহার বিপরীত শত্রুদল তোমাদিগকে ধাওয়া করিয়া তাড়াইয়া আনার প্রয়াস পাইল, তোমরা পরাজিতরূপে দ্রুত ছুটিতে লাগিলে।) এই অবস্থা সৃষ্টির দ্বারা আল্লাহ তোমাদিগকে পরীক্ষা করিতে চাহিলেন—(কে পাকা মোমেন, আর কে কাঁচা।) অবশ্য (যাহা ঘটিয়াছে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে (সেই ত্রুটির গোনাহ) ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন; আল্লাহ তায়ালা মোমেনগণের প্রতি অতিশয় মেহেরবান। (৪ পাঃ ৬ রুঃ)

উল্লিখিত আয়াতে যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় মোসলমানদের সুস্পষ্ট বিজয় এবং শত্রু সেনাকে রণাঙ্গন হইতে উচ্ছেদ করা, অতঃপর তীরান্দাজ বাহিনীর লোকদের ভুল ধারণার বশীভূত হইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদেশ বিরোধী কার্য্যে লিপ্ত হওয়া তথা যুদ্ধের অবসান ধারণা করিয়া নির্দ্ধারিত ঘাটি ত্যাগ করা এবং তদ্দরুন অবস্থার অবনতি ঘটা ইত্যাদি বিষয়ের ইঙ্গিত রহিয়াছে।

১৪৪০। **হাদীছ**ঃ—বরা ইবনে আজেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওহোদের জেহাদের দিন আমরা কাফের শত্রু সেনার সম্মুখীন হইলাম। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম

তীরান্দাজ বাহিনীর একটি দলকে আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়েরের অধিনায়কত্বে একটি নির্দ্ধারিত স্থানে বসাইয়া দিলেন। তাহাদের প্রতি তাঁহার সুস্পষ্ট নির্দেশ রহিল যে—আমাদিগকে বিজয়ী দেখিলেও তোমরা এই স্থান পরিত্যাগ করিও না এবং আমাদের উপর শত্রুর বিজয় দেখিতে পাইলেও তোমরা এই স্থান ত্যাগ করিয়া আমাদের সাহায্যে আসিও না। এইরূপ ব্যবস্থাধীনে যখন আমরা যুদ্ধ আরম্ভ করিলাম তখন শত্রুগণ রণাঙ্গন হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। এমনকি (তাহারা যে বিশেষ দৃঢ়তা প্রদর্শনের জন্য নারীগণকে সঙ্গে আনিয়াছিল সেই) নারীরাও দ্রুত দৌড়িবার জন্য পায়ের গোছা হইতে কাপড় টানিয়া ছুটাছুটি করিয়া পাহাড়ের আড়ালে যাইতেছিল।

এমতাবস্থায় তীরান্দাজ বাহিনীর লোকগণ বলিয়া উঠিলেন, শত্রুগণের ধন-সম্পদ তথা গনিমতের মালের সংরক্ষণ ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করা হউক। অধিনায়ক আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে এই নির্দেশ দান করিয়াছেন যে, তোমরা এই স্থান ত্যাগ করিবে না। অধিকাংশ সঙ্গিগণ উপস্থিত পরিস্থিতেও সেই আদেশ বলবৎ আছে বলিয়া স্বীকার করিল না। সেই আদেশ বিরোধী কার্য্যে লিপ্ত হওয়ায় অবস্থার অবনতি ঘটিল, ফলে সত্তর জন ছাহাবী শহীদ হইলেন।

শত্রু সেনার দলপতি আবু সুফিয়ান মোসলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের মধ্যে মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) জীবিত আছেন কি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, কোন উত্তর দিও না। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিল, ইবনে আবী কোহাফা (আবু বকর (রাঃ)) জীবিত আছেন কি? হযরত (দঃ) উত্তর দানে নিষেধ করিলেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিল তোমাদের মধ্যে খাত্তাবের পুত্র (ওমর (রাঃ)) জীবিত আছেন কি? এইবারও হযরত উত্তর প্রদানে নিষেধ করিলেন। ইহার উপর আবু সুফিয়ান মন্তব্য করিল—তাহারা সকলেই নিহত হইয়াছে, তাহারা জীবিত থাকিলে নিশ্চয় উত্তর প্রদান করিত। তাহার এই মন্তব্য শ্রবণে ওমর (রাঃ) নিজকে বারণ রাখিতে পারিলেন না। তিনি ক্রোধ ভরে বলিয়া উঠিলেন, হে খোদার দুশমন! তুই মিথ্যা মন্তব্য করিতেছিস্; তোকে পদদলিতকারী তাঁহাদের সকলকেই আল্লাহ তায়ালা জীবিত রাখিয়াছেন।

অতঃপর আবু সুফিয়ান اُعْلُ هُبَلْ "হুবালের জয়" বলিয়া ধ্বনি দিল ("হুবাল" তাহাদের একটি দেবতার নাম)। রসুলুল্লাহ (দঃ) ছাহাবীগণকে এই ধ্বনির প্রতিউত্তর দানের আদেশ করিলেন এবং সমবেত স্বরে এই ধ্বনি দিতে বলিলেন اَللّٰهُ اَعْلٰى وَاَجَلُّ "আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বমহান।"

অতঃপর আবু সুফিয়ান বলিল, لَنَا الْعُزّٰى وَلَا عُزّٰى لَكُمْ "আমাদের ওজ্জা (দেবতা) আছে, তোমাদের উহা নাই"। হযরত (দঃ) ছাহাবীগণেকে ইহার প্রতিউত্তর দানের আদেশ করিলেন, এবং সমবেত স্বরে এই ধ্বনি দিতে বলিলেন— اَللّٰهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَا لَكُمْ "আল্লাহ আমাদের সাহায্যকারী আছেন, তোমাদের কেহ সাহায্যকারী নাই।" আবু সুফিয়ান

(তাহার গর্ব-ধ্বনির প্রত্যুত্তরে স্তব্ধ হইয়া) বলিল, আজিকার দিন বদরের দিনের বিনিময়ে ; হার-জিত পালাক্রমেই হইয়া থাকে। আবু সুফিয়ান আরও বলিল, নিহতদের নাক-কান কাটার ঘটনা ঘটিয়াছে বটে, উহা আমার আদেশে হয় নাই, অবশ্য আমি অসন্তুষ্টও নহি।

১৪৪১। **হাদীছ :**—বরা ইবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওহোদের জেহাদকালীন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ)-এর অধীনে পদাতিক তীরান্দাজ বাহিনীকে এক নির্দিষ্ট স্থানে মোতায়েন করিয়া দিয়াছিলেন। সেই তীরান্দাজ বাহিনীর ত্রুটির দরুণ যখন মোসলমানগণ বেকায়দায় পতিত হইলেন এবং চতুর্দিক হইতে শত্রুর কবলে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন তখন মোসলমান সৈন্য দলের শৃঙ্খলা বাকি থাকিল না ; এক একজন এক একস্থানে আবদ্ধ রূপে লড়াই করিতে ছিলেন—কেহ বা শহীদ হইতে ছিলেন, কেহ বা শত্রু সেনা ভেদ করিয়া আসিতেছিলেন। এবং (কিছু সংখ্যক লোক) পরাজিত অবস্থায় ছুটাছুটি করিতেছিলেন। সেই পরিস্থিতিতেই হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে পেছন হইতে ডাকিতেছিলেন।

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا.....

অর্থ—তোমাদের উপর যখন বিপদের করালছায়া নামিয়া আসিল, অবশ্য তোমরা ইতিপূর্বে শত্রু পক্ষকে ইহার দ্বিগুণ বিপদে পতিত করিতে সক্ষম হইয়া ছিলে (সেই অবস্থার রূপ ধারণে) তোমরা স্তম্ভিত হইয়া বলিতে লাগিলে, আমাদের উপর এই বিপদ কোথা হইতে আসিল ? আপনি তাহাদিগকে তদুত্তরে বলিয়া দিন, তোমাদের পক্ষ হইতেই তোমাদের উপর এই বিপদ আসিয়াছে। (অর্থাৎ তোমাদেরই ত্রুটির দরুণ তোমরা এই বিপদে পতিত হইয়াছ।) আল্লাহ তায়ালা সব কিছু করিতে সক্ষম। (৪ পাঃ ৭ রুঃ)

১৪৪২। **হাদীছ :**— সায়াদ ইবনে আবু অক্কাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওহোদের রণাঙ্গনে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় তীরদান হইতে সমুদয় তীর আমার সম্মুখে রাখিয়া দিয়া আমাকে (স্নেহভরে) বলিলেন, আমার মাতা-পিতা তোমার প্রতি উৎসর্গ ; তুমি যথাসাধ্য তীর ছুড়িতে থাক।

১৪৪৩। **হাদীছ :**—আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, একমাত্র সায়াদ ইবনে আবু অক্কাছ (রাঃ)-ই এইরূপ সৌভাগ্যশালী ছিলেন যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় মাতা-পিতা উৎসর্গ বলিয়া তাহার সম্পর্কে উক্তি করিয়াছিলেন—অন্য কাহারও সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (দঃ)কে ঐরূপ উক্তি করিতে আমি শুনি নাই।

ব্যাখ্যা :—বিশিষ্ট ছাহাবী ছায়াদ ইবনে আবু অক্কাছ (রাঃ) তীর ছুড়িতে খুবই পটু ছিলেন, তাঁহার প্রতিটি তীর কার্য্যকরী হইয়া থাকিত। রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় ছাহাবীগণের

গুণাগুণের বিশেষ মর্য্যাদা দান করিয়া থাকিতেন। আলোচ্য ঘটনায় হযরতের সেই অমায়িক স্বভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। মাতা-পিতা উৎসর্গের উক্তি হযরত (দঃ) মোবারের (রাঃ) সম্পর্কেও করিয়াছেন—আলী (রাঃ) তাহা শুনেন নাই।

১৪৪৪। **হাদীছ ঃ**—আবু ওসমান (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওহোদের রণাঙ্গনে এমন সময়ও গিয়াছে যখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে একমাত্র ছায়াদ (রাঃ) এবং তাল্‌হা (রাঃ) ব্যতীত অন্য কোন লোক ছিলেন না।

ব্যাখ্যা ঃ—ওহোদ রণাঙ্গনে মোসলমানগণ শত্রুদল কর্তৃক সম্মুখ ও পশ্চাদ উভয় দিক হইতে আক্রান্ত হওয়ার পর যখন সৈন্য দলের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়া গেল তখন মোসলমান সৈন্যগণ বিভিন্ন স্থানে পরিবেষ্টিত আকারে লড়িতে লাগিলেন। সেই বিচ্ছিন্নতা ও বিশৃঙ্খলাবস্থায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গিগণের সংখ্যা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঙ্কের ছিল।

১৪৪৫। **হাদীছ ঃ**—কায়েস (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি তাল্‌হা রাজিয়াল্লাহু আনহুর হস্ত অবশ অবস্থায় দেখিয়াছি; ওহোদের রণাঙ্গনে তিনি শত্রুগণ কর্তৃক রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি নিক্ষিপ্ত তীর সমূহ স্বীয় বাহু দ্বারা প্রতিহত করিয়াছিলেন।

১৪৪৬। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওহোদের রণাঙ্গনে যখন মোসলমান সৈন্যগণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল তখন আবু তাল্‌হা (রাঃ) হযরতের নিকটে ছিলেন। তিনি রসুলুল্লাহ (দঃ)কে একটি ঢালের আড়ালে আবৃত করিয়া রাখিলেন। আবু তাল্‌হা (রাঃ) বিশিষ্ট তীরান্দাজ ছিলেন, ওহোদের রণাঙ্গনে তিনি ২/৩টি ধনু ভাঙ্গিয়া ছিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) কোন ব্যক্তিকে তীর লইয়া যাইতে দেখিলেই বলিতেন, তীরসমূহ আবু তাল্‌হার সম্মুখে রাখিয়া যাও। হযরত (দঃ) ঐ ঢালের আড়াল হইতে সময় সময় মাথা উঁচু করিয়া শত্রু পক্ষের প্রতি তাকাইতেন। আবু তাল্‌হা (রাঃ) কাতর স্বরে নিবেদন করিতেন, আপনার জন্য আমার জীবন উৎসর্গ—আপনি মাথা উঠাইবেন না, হঠাৎ শত্রু পক্ষের তীর আপনার শরীরে লাগিয়া যাইতে পারে।

আনাছ (রাঃ) ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, আয়েশা (রাঃ) এবং উম্মে ছোলায়েম রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার ন্যায় ব্যক্তিবর্গকে ঐ দিন দেখিয়াছি, বিশেষ তৎপরতার সহিত নিজ নিজ পৃষ্ঠে বহন করতঃ মশক ভরিয়া ভরিয়া পানি আনিতেন এবং আহত ব্যক্তিবর্গের মুখে ঢালিয়া দিতেন।

১৪৪৭। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওহোদের রণাঙ্গনে প্রথম অবস্থায় শত্রুপক্ষ মোশরেকগণ পরাজিত হইল। (অতঃপর যখন মোসলমান সৈন্যদের পশ্চাৎদিকের পথ বাধামুক্ত পাইয়া খালেদ বাহিনী ঐ পথে মোসলমানদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালাইল) তখন (মোসলমান সৈন্যগণের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে) ইবলিস শয়তান চীৎকার করিয়া বলিল, হে মোসলমানগণ! তোমাদের পেছনে দেখ।

তখন তাড়াহুড়ার মধ্যে মোসলমান সৈন্যদেরই অগ্রভাগ ও পশ্চাদ ভাগের মধ্যে সংঘর্ষ হইল। সেই পরিস্থিতিতে হোজায়ফা (রাঃ) দেখিলেন, তাঁহার পিতা ইয়ামন (রাঃ) মোসলমান সৈন্যদের দ্বারাই আক্রান্ত হইতেছেন, তখন হে আল্লার বন্দাগণ! আমার পিতা, আমার পিতা—বলিয়া হোজায়ফা (রাঃ) চীৎকার করিলেন। কিন্তু তখন তরবারি সংবরণ সম্ভব হইল না, ইয়ামন (রাঃ) নিহত হইলেন। এই ঘটনায় হোজায়ফা (রাঃ) মর্মাহত হইলেন বটে, কিন্তু অবস্থা দৃষ্টে কাহারও প্রতি কোন দাবী দাওয়া রাখিলেন না, বরং অনিচ্ছাকৃত হত্যাকারীদের জন্য আল্লাহ তায়ালার দরবারে ক্ষমা চাহিলেন। অবশ্য হোজায়ফা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অন্তরে এই ঘটনার অনুতাপ চিরজীবন বাকি রহিল।

১৪৪৮। **হাদীছ ঃ**—ছা'লাবা ইবনে মালেক (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওমর (রাঃ) (স্বীয় খেলাফত কালে একদা) কতকগুলি চাদর কতিপয় মদীনাবাসী নারীর মধ্যে বণ্টন করিলেন; একটি উত্তম চাদর অবশিষ্ট থাকিল। সকলেই অভিপ্রায় জানাইল যে, আপনার সহ ধর্মিনী—আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কন্যা উম্মে-কুলছুমকে এই চাদরটি প্রদান করুন। ওমর (রাঃ) বলিলেন, না, না; মদীনাবাসিনী উম্মে ছালীৎ (রাঃ) ইহা লাভের অগ্রাধিকারিণী; তিনি ওহোদ-রণাঙ্গনে আমাদের জন্য মশক ভরিয়া পানি আনিয়াছিলেন।

হাম্‌যা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শাহাদত ঃ

১৪৪৯। **হাদীছ ঃ**—জাফর ইবনে আম্‌র (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি ওবায়দুল্লাহ ইবনে আদী রহমতুল্লাহ আলাইহের সঙ্গে ভ্রমণরত ছিলাম। আমরা যখন "হেম্‌ছ" নামক স্থানে পৌঁছিলাম তখন তিনি আমাকে বলিলেন, ওয়াহ্‌শী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট উপস্থিত হওয়ার আগ্রহ হয় কি? তিনি ওহোদ রণাঙ্গনে কাফের দলভুক্ত ছিলেন, তাঁহার অতর্কিত আক্রমণেই হামযা (রাঃ) শাহাদৎ বরণ করিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, হাঁ—তাহার নিকট উপস্থিত হইব। ওয়াহ্‌শী "হেম্‌ছ" শহরেই বসাবস করিতেন, আমরা লোকদের নিকট তাঁহার খোঁজ জিজ্ঞাসা করিলাম। আমাদিগকে তাঁহার খোঁজ দেওয়া হইল। আমরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সালাম করিলাম। আমার সঙ্গী ওবায়দুল্লাহ ইবনে আদী (রঃ) কাপড়-চোপড়ে এরূপ আবৃত হইলেন যে, তাঁহার পা ও চক্ষুদ্বয় ভিন্ন আর কোন অংশ যেন দৃষ্টিগোচর না হয়। ওবায়দুল্লাহ ইবনে আদী (রঃ) এই অবস্থায় ওয়াহ্‌শী (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাকে চিনেন কি?

ওয়াহ্‌শী (রাঃ) তাঁহার প্রতি তাকাইলেন এবং একটু রসিকতার সহিত বলিলেন, না—চিনি না, তবে কিন্তু আমার স্মরণ আছে যে, আদী ইবনে খেয়ার (রাঃ) "উম্মে কেতাল" নাম্নী একটি নারী বিবাহ করিয়াছিলেন, সেই ঘরে একটি ছেলে জন্মিয়াছিল এবং সেই ছেলের জন্য দাই বা ধাত্রী আমিই খোঁজ করিয়া আনিয়া দিয়াছিলাম; তোমার পা দুইটি দেখিয়া সেই ছেলের ন্যায় মনে হয়। ওবায়দুল্লাহ (রঃ) যখন দেখিলেন যে, ওয়াহ্‌শী (রাঃ)

তাঁহাকে পূর্ণরূপে চিনিতে পারিয়াছেন তখন স্বীয় চেহারা উন্মুক্ত করিলেন। অতঃপর বলিলেন, আপনি হামযা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শাহাদতের ঘটনা আমাদিগকে শুনাইবেন কি? তিনি বলিলেন—হাঁ।

বদরের রণাঙ্গনে হাম্‌যা (রাঃ) তোয়ায়মা ইবনে আদী ইবনে খেয়ারকে হত্যা করিয়াছিলেন। তাহার ভাতিজা—আমার মনীব জোবায়ের ইবনে মোতয়েম সেই আক্রোশে আমাকে বলিল, যদি আমার চাচার প্রতিশোধে হাম্‌যাকে তুমি হত্যা করিতে পার তবে তোমাকে আমি (দাসত্ব হইতে) মুক্তি দান করিব।

ওহোদ সংলগ্ন আইনাইন পাহাড়ের নিকটস্থ যেই যুদ্ধ হইয়াছিল সেই যুদ্ধের জন্য যখন মক্কাবাসীরা যাত্রা করিল তখন আমিও তাহাদের সহযাত্রী হইলাম। রণক্ষেত্রে যখন উভয় পক্ষের সৈন্যদল প্রস্তুত হইয়া সারিবদ্ধরূপে দাঁড়াইল, তখন (কাফের সৈন্যদলের মধ্য হইতে) 'সেবা' নামক বাহাদুর ময়দানে অবতরণ করিয়া মোসলমানদের প্রতি প্রতিদ্বন্দিতার আহ্বান জানাইল। হাম্‌যা (রাঃ) তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি লাফাইয়া পড়িলেন এবং হে খত্‌নাকারিণীর পুত্র সেবা। তুই আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের বিরুদ্ধে শত্রুতা বাঁধিয়াছিস্? এই বলিয়া তরবারির এমন আঘাত করিল যে, সেবার অস্তিত্ব বিলীন হইয়া গেল। (হাম্‌যা (রাঃ) যেই দিকেই ধাওয়া করিতেন সেই দিকেই বিপক্ষ সেনাদল শুষ্ক পাতার স্তুপ ছড়াইয়া যাওয়ার ন্যায় বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইত।)

ওয়াহ্‌শী (রাঃ) বলেন, আমি হাম্‌যা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উদ্দেশ্যে একটি বড় পাথরের আড়ালে লুকাইয়া রহিলাম। যখন তিনি আমার বরাবরে আসিলেন তখন আমি আমার (বিষাক্তরূপে প্রস্তুত) বর্শাটি তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলাম। বর্শাটি তাঁহার নাভির তলদেশে বিদ্ধ হইয়া পিছন দিকে বাহির হইয়া গেল। এই আঘাতেই তাঁহার জীবনের অবসান ঘটিল।

ওয়াহ্‌শী (রাঃ) বলেন, সেই যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর আমি মক্কায় অবস্থান করিতে লাগিলাম। অতঃপর যখন মক্কা মোসলমানদের করতলগত হইয়া গেল তখন আমি 'তায়েফ' শহরে চলিয়া গেলাম। কিছু দিনের মধ্যেই তায়েফবাসীগণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণের ব্যবস্থা করিতেছিল। আমি শুনিতে পাইলাম, হযরত (দঃ) প্রতিনিধি দলকে কোন প্রকারেই বিব্রত করেন না। তাই আমি এই সুযোগকে সযত্নে গ্রহণ করিলাম এবং প্রতিনিধি দলের সদস্যরূপে রসুলুল্লাহ (দঃ) সমীপে উপস্থিত হইলাম (এবং ইসলামের কালেমা পাঠ করিলাম।) হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমিই ওয়াহ্‌শী? আমি আরজ করিলাম, হাঁ। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি হাম্‌যা (রাঃ)কে শহীদ করিয়াছিলে? আমি আরজ করিলাম, আপনি যাহা শুনিয়াছেন তাহা সত্য। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তুমি কি ইহা করিতে পার যে, তুমি আমার দৃষ্টিগোচরে না আস?

অতঃপর আমি চলিয়া আসিলাম। রসুলুল্লাহ (দঃ) ইহজগত ত্যাগের পর নবুয়তের মিথ্যা দাবীদার মিথ্যাবাদী মোসায়লামাহ মোসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। আমি সেই যুদ্ধে যোগদানের ইচ্ছা করিলাম—আমি ভাবিলাম, যদি মিথ্যাবাদী মোসায়লামার ন্যায় ইসলামের শত্রুকে ধ্বংস করিতে পারি তবে হাম্‌যা (রাঃ)কে শহীদ করার কিছুটা বিনিময় সাধন সম্ভব হইবে। এই ভাবিয়া আমি রণে যাত্রা করিলাম। রণক্ষেত্রে যাইয়া (আমি একটি দেয়ালের আড়ালে বর্শা হাতে লইয়া অপেক্ষমান রহিলাম)। দেওয়ালের একটি স্থান ভগ্ন ছিল সেই পথে আমি মোসায়লামাকে দেখিতে পাইলাম, সে উষ্ট্রের ন্যায় বিরাট দেহাকারের ছিল। যুদ্ধে লিপ্ততায় তাহার মাথার চুলগুলো এলোমেলো হইয়া গিয়াছিল। তাহাকে দেখামাত্র আমি তাহার প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করিলাম এবং উহা বুকের মধ্যে বিদ্ধ হইয়া পৃষ্ঠের দিকে বাহির হইয়া আসিল। তৎক্ষণাৎ একজন মদীনাবাসী ছাহাবী ছুটিয়া আসিয়া তাহার শিরচ্ছেদ করিয়া ফেলিলেন।

ওয়াহ্‌শী (রাঃ) যে, সেই মিথ্যাবাদী মোসায়লামার হত্যাকারী ছিলেন। তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই ঘটনার মধ্যেও পাওয়া যায় যে, মোসায়লামার দলীয় একটি নারী তাহার শোক প্রকাশে বলিয়াছিল, আ···হ্! আমাদের আমীর, তিনি একটি অতি সাধারণ ব্যক্তি হাবশী গোলামের হাতে নিহত হইয়াছেন।

ওহোদের জেহাদে হযরতের আঘাতসমূহ ঃ

ওহোদ-জেহাদে রসুলুল্লাহ (দঃ) মূল যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। যখন বিপদের ছায়া নামিয়া আসিল, তখন মোসলমানগণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেন, বড় বড় বাহাদুরগণ স্থানে স্থানে বেষ্টিতাকারে লড়িতেছিলেন, কিছু সংখ্যক ভীষণ আহত হইয়া রহিলেন, কিছু সংখ্যক হতাশ হইয়া ছুটাছুটি করিতেছিলেন; তখন হযরতের প্রতি শত্রুদের তীব্র আক্রমণ হয়। হযরত (দঃ) বহু সংখ্যক আঘাতে আহত হন। কতিপয় আঘাত ভয়ঙ্কর ছিল। (১) নীচের সারির ডান দিকস্থ চোখা দাঁতের বাম দিক সংলগ্ন দাঁতটির অংশবিশেষ প্রস্তরের আঘাতে ভাঙ্গিয়া গিয়া ছিল। (২) নীচের ঠোঁটটি ভিতর দিকে যখমী হইয়া গিয়াছিল। (৩) লৌহ শিরস্ত্রাণের কড়া চোয়ালের হাড় ভাঙ্গিয়া এইরূপে বিদ্ধ হইয়াছিল যে, ওবায়দাতুবনুল জাররাহ্ (রাঃ) কর্তৃক উহা কামড় দিয়া বাহির করিতে তাঁহার দুইটি দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

১৪৫০। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (ওহোদের যুদ্ধে আহত অবস্থায় অনুতপ্ত হইয়া) বলিতেছিলেন, ঐ জাতির প্রতি আল্লাহ তায়ালা ভীষণ ক্রুদ্ধ যাহারা স্বীয় পয়গাম্বরের সঙ্গে এই ব্যবহার করিয়াছে—এই বলিয়া তিনি স্বীয় ভাঙ্গা দাঁতের প্রতি ইশারা করিলেন। তিনি আরও বলিলেন, যে ব্যক্তি জেহাদাবস্থায় আল্লার রসুলের হাতে নিহত হয় সে আল্লাহ তায়ালার ভীষণ ক্রোধের পাত্র।

ব্যাখ্যা—ওহোদের যুদ্ধেই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আঘাতে উবাই ইবনে খলফ নামক কাফেরের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। সে দম্ভভরে হযরতের প্রতি ছুটিয়া আসিয়াছিল। হযরত (দঃ) একটি ছোট বর্শা হাতে লইয়া তাহার গর্দানের উপর মারিলেন, সামান্য একটু যখম হইল, কিন্তু সে উহাতেই অস্থির হইয়া পড়িল, এমনকি শেষ পর্য্যন্ত সে ঐ যখমেই মৃত্যু মুখে পতিত হইল।

১৪৫১। **হাদীছ**ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার অতি ক্রোধের পাত্র যাহার মৃত্যু আল্লার রসুলের হাতে ঘটিয়া থাকে।

ঐ জাতির প্রতি আল্লাহ তায়ালার ভীষণ ক্রোধ যাহারা আল্লার নবীর চেহারাকে রক্তাক্ত করিয়াছে।

১৪৫২। **হাদীছ**ঃ—ছাহ্‌ল ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি জ্ঞাত আছি, কোন্ ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ক্ষত ধৌত করিতেছিলেন এবং কোন্ ব্যক্তি পানি ঢালিয়া দিতেছিলেন এবং কি বস্তু ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, ফাতেমা (রাঃ) ধৌত করিতেছিলেন, আলী (রাঃ) পানি ঢালিতেছিলেন। ফাতেমা (রাঃ) যখন দেখিলেন, পানি দ্বারা রক্ত বন্ধ হইতেছে না, তখন তিনি চাটাই ভাঙ্গা টুকরা আগুনে পুড়িয়া উহার ভস্ম দ্বারা যখমের মুখ ভরিয়া দিলেন রক্ত বন্ধ হইয়া গেল।

এতদ্ভিন্ন হযরতের একটি দাঁতও ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল এবং তাঁহার চেহারার উপর বিভিন্ন যখম হইয়াছিল এবং লৌহ শিরস্ত্রাণ ভাঙ্গিয়া মাথায় বিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

১৪৫৩। **হাদীছ**ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (ওহোদ-জেহাদের ঘটনার পর) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে ফজরের নামাযের মধ্যে দ্বিতীয় রাকাতের রুকু হইতে দাঁড়াইয়া ছামিয়াল্লাহুলিমান হামিদাহ, রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ বলিয়া এইরূপ বলিতে শুনিয়াছি—

اَللّٰهُمَّ الْعَنْ صَفْوَانَ بْنَ اُمَيَّةَ وَسُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو وَالْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ ٥

অর্থ—হে আল্লাহ অভিশাপ বর্ষণ কর ছাফ্‌ওয়ান ইবনে উমাইয়ার উপর, সোহায়েল ইবনে আম্‌রের উপর এবং হারেছ ইবনে হেসামের উপর। (৫৮২ পৃঃ)

হযরতের এই অভিশাপের প্রতিবাদে কোরআন শরীফের আয়াত নাযেল হয়।

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ ٥

অর্থ—(আপনি কাফেরদের প্রতি আল্লার গজব তথা তাহাদের ধ্বংস কামনা করেন বা তাহাদের সৎপথ অবলম্বন করা হইতে নিরাশ হইয়া ব্যথিত হন, এইসব আপনার পক্ষে

সমীচীন বা ফলদায়ক নহে। কারণ, তাহাদের ধ্বংস হওয়া বা সৎপথের পথিক হওয়া সম্পর্কে) আপনার কোন অধিকার বা স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের অবকাশ নাই। (এই সম্পর্কে সর্বাধিকারের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তায়ালা; তিনি) হয়ত তাহাদের প্রতি করুণার দৃষ্টি করিবেন (তথা সৎপথের পথিক বানাইবেন; ইহা তাহাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত গণ্য হইবে।) কিম্বা তাহাদিগকে এইসব দুষ্কৃতির শাস্তি প্রদান করিবেন, কারণ তাহারা বাস্তবিকই দুষ্কৃতিকারী। (৪ পাঃ ৩ রুঃ)

● আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) ওহোদের ঘটনায় (মক্কাবাসী কাফেরগণ কর্তৃক) ভীষণরূপে আঘাত পান। (তাঁহার দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়)। তিনি মুখমণ্ডলের রক্ত মুছিতেছিলেন এবং (অনুতপ্ত হইয়া অভিশাপ উদ্দেশ্যে) বলিলেন, كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ "ঐ জাতির মুক্তি ও মঙ্গল কিরূপে সম্ভব হইবে যাহারা স্বীয় পয়গাম্বরকে এইরূপে যখমী করিয়াছে? (অথচ সেই পয়গাম্বর তাহাদিগকে তাহাদের সৃষ্টিকর্তার প্রতি আহ্বান জানাইতেছেন।)" হযরতের এই মনোভাবের বিরুদ্ধে কোরআনের আয়াত নাযেল হয়—

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ

ব্যাখ্যা:— হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কাবাসী কাফেরদের আচরণে অনুতপ্ত হইলেন, এমনকি তাহাদের প্রতি বদ-দোয়ার বাক্যও হযরতের মুখে উচ্চারিত হইল। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) দয়ার দরিয়া ধৈর্য্যের পাহাড় ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। তায়েফের ঘটনায় কাফেররা হযরতের উপর প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষিত করিয়াছিল, তাঁহার মাথার রক্ত পায়ের জুতাকে আটকাইয়া দিয়াছিল, তিনি আঘাতের অসহ্য যাতনায় চৈতন্যহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। আল্লার তরফ হইতে ফেরেশতাগণ প্রতিশোধের অনুমতি চাহিতে ছিলেন এই অবস্থায়ও হযরত দয়া ভুলেন নাই, ধৈর্য্য হারান নাই; কষ্ট যাতনা প্রদানকারীদের পক্ষে সৎপথ অবলম্বনের দোয়া করিয়াছেন, বরং সেই আশাও পোষণ করিয়াছেন। তদ্রূপ আলোচ্য ওহোদের ঘটনায়ও হযরত তাঁহার ধৈর্য্য ও দয়া ছাড়িতে পারেন নাই। 'যোরকানী' নামক কিতাবে উল্লেখ আছে, এই ঘটনায়ও হযরত আহত হইয়া রক্তের ফোটা মাটিতে পড়িতে দেন নাই; তাহার রক্তের ফোটা মাটিতে পড়িলে ভূপৃষ্ঠে আল্লার গজব আসিবে, তাই তিনি স্বীয় রক্ত নিজ হাতে মুছিতে ছিলেন এবং বলিতে ছিলেন— اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ "হে আল্লাহ আমারই গোত্রীয় লোকদের কার্য্য তুমি ক্ষমা কর; তাহারা নির্বোধ।"

এতদসত্ত্বেও ওহোদের ঘটনায় কাফেরদের নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা এইরূপ চরমে পৌঁছিয়াছিল যে, সেই অবস্থায় অনুতাপ ও বিরক্তি প্রতিরোধ করা মানুষ হিসাবে হযরতের জন্য সম্ভব হইয়াছিল না।

এখানেই আল্লাহ পাকের অসীম দয়া ও সহিষ্ণুতার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বিদ্রোহীগণ কর্তৃক স্বীয় প্রতিনিধি মাহবুবের এইরূপ অত্যাচারিত হওয়াকে ধৈর্য্য সহকারে শুধু নিবিড় নিরীক্ষণই করিতে ছিলেন না, বরং এইরূপ নিষ্ঠুর আচরণে রক্তাক্তাবস্থায় পতিত স্বীয় মাহবুবের মুখে অনুতাপের বাক্যও বরদাশ্‌ত করিলেন না। আল্লাহ তায়ালা আপন বন্ধুগণ হইতে যাহা পাইতে চান তাহা এই যে—"আমার পথে কষ্ট-যাতনা সহ্যই করিয়া যাইবে উহ্‌ও করিতে পারিবে না!"

ওহোদের রণাঙ্গনে আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত ঃ

ওহোদের রণাঙ্গনে মোসলমানদের অনেক ক্ষয়-ক্ষতিই হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই অবস্থায়ও আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত মোসলমানদের পক্ষে থাকার কতিপয় নিদর্শন পরিলক্ষিত হইয়াছিল। আল্লাহ তায়ালা শর্বশক্তিমান। মুহূর্তের মধ্যে তিনি সব কিছু ঘটাইতে পারেন, কিন্তু ইহজগৎ মানবের পরীক্ষাকেন্দ্র ও কর্মস্থল; সাধারণতঃ ও স্বাভাবিকরূপে ইহজগতে আল্লাহ তায়ালা মানবের কার্য্যের মাধ্যমেই ফলাফল প্রকাশিত করিয়া থাকেন। সেই ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থার ঊর্দ্ধে কোন ফল লাভ হইলে উহা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত। সেই বিশেষ রহমত কদাচিত মানবের কার্য্যধারার প্রতিক্রিয়া ও ফলাফলের বিপরীত বা বহু গুণ ঊর্দ্ধে হইয়া থাকে, সেইরূপ হইলে উহা আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরতের নিদর্শন। আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান, তাঁহার কুদরত অসীম; কিন্তু উহার নিদর্শন সর্বাবস্থায় প্রকাশিত হওয়ার বাধ্য-বাধকতা নাই। স্বাভাবিক ও সাধারণরূপে মানবের কার্য্যধারার প্রতিক্রিয়া ও ফলাফলের ভিতর দিয়াই আল্লাহ তায়ালা কৃপা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ইহাই আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত; এই ধরণের রহমতই ওহোদের রণাঙ্গনে আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে হইয়াছিল। মোসলমানদের স্বীয় কার্য্য-ধারার ফলাফল ও প্রতিক্রিয়ার ক্ষয়-ক্ষতির ভিতর দিয়াই আল্লাহ তায়ালার কৃপার নিদর্শন পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

আল্লাহ তায়ালা ওহোদ-রণাঙ্গনেও মোসলমানদের সাহায্যে ফেরেশতা পাঠাইয়াছিলেন।

১৪৫৪। **হাদীছ ঃ**— সায়াদ ইবনে আবু অক্কাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওহোদের রণাঙ্গণে আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে স্পষ্টরূপে দেখিয়াছি তাঁহার সঙ্গে দুইজন লোক তাঁহার পক্ষ হইয়া লড়াই করিতেছেন। তাঁহাদের পরিধানে সাদা পোষাক। ইতিপূর্বে তাঁহাদিগকে দেখি নাই, যুদ্ধের পরেও আর তাঁহাদিগকে দেখিতে পাই নাই। (৫৮৫পৃঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—মোসলেম শরীফে উল্লেখ আছে যে, এই দুইজন ছিলেন মানুষ বেশে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) ও হযরত মিকাঈল (আঃ)। আল্লাহ তায়ালা এই ভীষণ অবস্থায় ফেরেশতা-গণের দ্বারা হযরতের প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আঘাত হইতে রক্ষা করেন নাই; এই ধরণের ঘটনা সমূহ আল্লাহ তায়ালার বেনেয়াজির অজেয় এবং অনাবিষ্কৃত ভেদ-রহস্য।

এতদ্ভিন্ন কোরআন শরীফে আরও একটি বিশেষ রহমতের উল্লেখ আছে—

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ ○

অর্থ—তোমরা কষ্ট ক্লিষ্ট চিন্তামগ্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের চিন্তা দূরীভূত করিয়া প্রসন্নতা ও শান্তি আনয়নের জন্য তোমাদের উপর নিদ্রা-ভার চাপাইয়া দিলেন। সেই নিদ্রা তোমাদের একটি দল (তথা খাঁটী মোমেনগণকে) পরিবেষ্টিত করিয়া লইয়াছিল। (পক্ষান্তরে রণাঙ্গনের মধ্যেও যে কতকজন মোনাফেক ছিল তাহারা এই নেয়ামত হইতে বঞ্চিত থাকিয়া নানা কুচিন্তায় মগ্ন হইল।) (৪ পাঃ ৬ রুঃ)

১৪৫৫। **হাদীছ :**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ওহোদ-জেহাদের দিন বলিয়াছেন, ঐ যে জিব্রাঈল (আঃ) স্বীয় ঘোড়ার লাগাম হাতে রণাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার পরিধানে সমরাস্ত্র রহিয়াছে। (৫৭৮ পৃঃ)

১৪৫৬। **হাদীছ :**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবু তাল্‌হা (রাঃ) নিজের অবস্থা বয়ান করিয়াছেন যে, আমিও ঐ দলে ছিলাম—ওহোদের রণাঙ্গনে যাহাদিগকে নিদ্রা পরিবেষ্টিত করিয়াছিল। এমনকি নিদ্রা ভারে আমার হাত হইতে তরবারি বার বার পতিত হইতেছিল—বার বার আমি উহাকে উঠাইতাম।

ব্যাখ্যা :—ক্ষয়-ক্ষতি, যখম ইত্যাদি পীড়াদায়ক ও যাতনাদায়ক—ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ঐ সবের চিন্তায় মগ্ন ও জর্জরিত থাকা অধিক পীড়া ও যাতনাদায়ক। পক্ষান্তরে এইরূপ অবস্থায় চিন্তামগ্ন না থাকিয়া নিদ্রামগ্ন হওয়া শান্তি আনয়নে অধিক সহায়ক হয়। সেই হিসাবেই আল্লাহ তায়ালা মোসলমানদের মধ্যে দ্রুত শান্তি আনয়নের জন্য এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যেরূপ কেহ আছাড় খাইয়া হাত-পা বিকল হইয়া পড়িলে ডাক্তার উহার উপর অস্ত্রপাচার করেন, কিন্তু উহা সত্বর শুষ্ক হওয়ার জন্য ব্যাণ্ডিজের ব্যবস্থাও করেন।

মোসলমান সৈনিকদের ত্রুটি মার্জনার ঘোষণা :

মোসলমানদের যে ত্রুটি হইয়াছিল, উহার বিষময় ফল ভোগ হইতে মোসলমানগণ নিস্তার পাইলেন না, বরং উহাতে সকলেরই অংশীদার হইতে হইল—

چوں از قومے یکے بیدانشی کرد × نہ کہ را منزلت باشد نہ مہ را

"দলের মধ্যে একজন মানুষের অসতর্কতার দরুনও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে যে, ছোট-বড় সকলকেই উহার খারাব পরিণাম ভোগ করিতে হয়।"

কিন্তু যেহেতু মোসলমানদের ঐ ত্রুটি ইচ্ছাকৃত তথা কোন প্রকার বিরোধী মনোভাবযুক্ত ছিল না, বরং একটি ভুল ধারনা প্রসূত ছিল মাত্র, তাই আল্লাহ তায়ালা কোরআন পাকের একাধিক আয়াতে বারংবার স্পষ্ট ভাষায় তাঁহাদের ত্রুটি মার্জনা ও ক্ষমার ঘোষণা

দিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, বরং যেহেতু মোসলমানদের পক্ষে এই ধরণের অতর্কিত বিপদ ও ক্ষয়-ক্ষতি ইহাই সর্বপ্রথম ছিল, তাই আল্লাহ তায়ালা তাঁহাদিগকে বিভিন্ন রকমে বুঝ-প্রবোধও দিয়াছেন। যথা—

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ...

অর্থ—যাহারা (ওহোদের রণাঙ্গনে) শত্রু সেনাদলের সম্মুখীন হওয়ার দিন ছিন্ন-বিচ্ছিন্নরূপে ছুটাছুটি করিয়াছিল তাহাদের স্বীয়কৃত নানাপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতির* দরুণ শয়তান তাহাদের পদস্খলন ঘটাইতে প্রয়াস পাইয়াছিল। আল্লাহ তাহাদের সব কিছু ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন; (তাহাদের প্রতি কেহ কটাক্ষ করিবে না।) আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাকারী, অতিশয় ধৈর্য্যশীল। (৪ পাঃ ৬ রুঃ)

এই আয়াতেরই একটু পূর্বে অপর আয়াতেও আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—ولقد عفا عنكم "আল্লাহ তোমাদের কৃত ত্রুটি ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন।"

মোসলমানদেরে বুঝ-প্রবোধ দান এবং ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে সুফল দানের বয়ান ঃ

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○.....

অর্থ—নিরুৎসাহ হইও না, চিন্তিত হইও না এবং বিশ্বাস রাখিও যে, তোমরাই প্রাবল্য ও প্রাধান্য লাভ করিবে যদি তোমরা খাঁটী মোমেন প্রতিপন্ন হও। (আজ) তোমরা ঘায়েল হইয়াছ বটে, (কিন্তু ইহা শত্রুপক্ষ কাফেরদের প্রাধান্যের প্রমাণ হইতে পারে না, কারণ পূর্বে—বদরের রণাঙ্গনে) শত্রুপক্ষও এইরূপ ঘায়েল হইয়াছিল। জাগতিক জীবনে) বিভিন্ন দলের বধ্যে পালাক্রমে জয়-পরাজয়ের সুযোগদান করা আমার একটি সাধারণ রীতি। এতদ্ভিন্ন (এই জয়-পরাজয়ের মাধ্যমে) আল্লাহ তায়ালা খাঁটি ঈমানেদারগণকে প্রকাশ্যে দেখিয়া নিতে চান, আর তোমাদের শাহাদৎ লাভের সুযোগ দিতে চান এবং খাঁটী মোমেনগণকে গোনাহ মাফ করিয়া পরিচ্ছন্ন করিতে এবং কাফেরদের মূল উচ্ছেদ করিতে চান।

---

* এই আয়াতে যে ত্রুটি-বিচ্যুতির উল্লেখ করা হইয়াছে উহার উদ্দেশ্য সাধারণ ত্রুটি-বিচ্যুতি যাহা বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ঐ রণাঙ্গণে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নির্দেশ-বিরোধী কার্য্য—নির্দিষ্ট স্থান পরিত্যাগ করার ত্রুটিও তন্মধ্যে একটি।

ইহা একটি স্বাভাবিক বাস্তব তথ্য যে, এক গোনাহ অন্য গোনাহের প্রতি টানিয়া নেয়। সেমতেই তাহাদের ঐ গোনাহ তাহাদিগকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া ছুটাছুটি করার গোনাহে লিপ্ত করিয়াছে, যেরূপ এক ব্যাধি অন্য ব্যাধিকে, এক উপসর্গ অন্য উপসর্গকে টানিয়া আনিয়া থাকে। এমনকি একই দলের কতিপয় ব্যক্তির কোন ত্রুটি-বিচ্যুতির ফলে যখন অন্য ত্রুটির সৃষ্টি হয় তখন উহাতে ঐ দলীয় অন্য লোকও জড়াইয়া পড়ে।

তোমরা কি ভাবিয়াছ—তোমরা বেহেশত লাভের অধিকারী হইয়া বসিবে এইরূপ পরিস্থিতির পূর্বেই যদ্দারা আল্লাহ তায়ালা প্রকাশ্যে দেখিয়া লইবেন, তোমাদের দলের মধ্যে কে কে (দীনের জন্য) সংগ্রামকারী ও ধৈর্য্যশীল?

তোমরা ত পূর্বে (জেহাদের সুযোগ লাভে) মৃত্যু (বরণ পূর্বক শাহাদৎ) লাভের আকাঙ্খা পোষণ করিয়া থাকিতে; এখন সেই আকাঙ্খার বস্তু দেখিতে পাইয়াছ। (৪ পারা ৫ রুকু)

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ...

অর্থ— (ওহোদের রণাঙ্গনে) শত্রু-সেনাদলের সম্মুখীন হওয়ার দিন তোমাদের উপর যাহা কিছু ঘটিয়াছিল তাহা আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায়ই ঘটিয়াছিল; (যাহাতে বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিহিত ছিল এবং) এই উদ্দেশ্যও ছিল যে, কে খাঁটী মোমেন ও কে মোনাফেক তাহা প্রকাশ পাইয়া যায়। (৪ পাঃ ৮ঃ)

ব্যাখ্যা :—ওহোদের জেহাদে মোসলমানগণ অনেক ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হইয়াছিলেন। মোসলমানগণকে এই ক্ষয়-ক্ষতির মধ্যে পতিত করার কতিপয় সুফলের বর্ণনা ও ইঙ্গিত উক্ত আয়াতদ্বয়ে করা হইয়াছে। যথা—

(১) আপদ-বিপদ, দুঃখ-কষ্ট ও ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমেই খাঁটী ভক্ত ও স্বার্থ শিকারীর পরিচয় প্রকাশ পাইয়া থাকে। এস্থলেও খাঁটী মোমেন ও মোনাফেকের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছিল। যাঁহারা খাঁটী মোমেন ছিলেন তাঁহারা দল ত্যাগীও হন নাই বা বিপদ দেখিয়া কোন সংশয়ের সম্মুখীও হন নাই। পক্ষান্তরে যাহারা মোনাফেক ছিল তাহাদের অধিকাংশ পথিমধ্য হইতেই দল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। আর যাহারা স্বীয় মোনাফেকীকে গোপন রাখায় যত্নবান ছিল তাহারা ঐ সময় দল ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া যায় নাই, বরং শেষ পর্য্যন্ত রণাঙ্গনে উপস্থিত ছিল, কিন্তু আপদ-বিপদের দরুন তাহারা নানাপ্রকার সংশয়ে পতিত হয় এবং দোষারোপের উক্তি করে। দল ত্যাগী মোনাফেকদের বর্ণনার আয়াত পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর মোনাফেকদের বর্ণনার আয়াত এই—

وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ .....

অর্থ—তোমাদের সঙ্গে অপর একটি দল আছে যাহাদের মনে স্বীয় জান বাঁচাইবার চিন্তা ভিন্ন আর কোন চিন্তাই নাই। তাহারা আল্লাহ সম্পর্কেও ভিত্তিহীন নির্বুদ্ধিতামূলক ধারণা জন্মাইতেছে (যে, রসুল ও মোসলমানদের সব কিছুর এখানেই পরিসমাপ্তি; আল্লাহ তাহাদের সহায়ক হওয়ার আশা-ভরসার অসারতা প্রতিপন্ন হইয়াছে, আল্লাহ তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন না ইত্যাদি ইত্যাদি। এমনকি) তাহারা এইরূপ উক্তিও করিয়া থাকে যে, আমাদের কথা কি কেহ শোনে? আমাদের কথা শোনা হইলে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হইত না। (৪ পাঃ ৬ রুঃ)

(২) "কতিপয় মোসলমানকে শাহাদৎ লাভের সুযোগ প্রদান করা।" শাহাদৎ যে কি অমূল্য বস্তু তাহার বর্ণনা সম্মুখে রহিয়াছে।

(৩) "আপদ-বিপদ, ক্ষয় ক্ষতির দ্বারা মোসলমানদের গোনাহ খাতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করতঃ তাহাদিগকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করা"। হাদীছ শরীফে আছে- মোসলমানের প্রতিটি কষ্ট-ক্লেশেই তাহার গোনাহ মাফ হয়, এমনকি তাহার পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হওয়ার যে কষ্ট হয় সেই কষ্টটুকু দ্বারাও তাহার গোনাহ মাফ হয়।

(৪) "কাফেরদের ধ্বংস সাধন করা।" আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা কাফেরদেরকে মোসলমানদের সংগ্রামের মাধ্যমে ধ্বংস করা। এমতাবস্থায় যদি প্রত্যেক ঘটনায়ই কাফেররা পরাজিত হইতে থাকে তবে ২/৪টি ঘটনার পর কাফেররা সম্মুখে আসিবে না, দুরে দুরে থাকিয়া মোসলমানদের ক্ষতি সাধনে লিপ্ত থাকিবে। ইহাতে তাহাদের মূলউচ্ছেদ কঠিন হইবে। সময় সময় তাহারা স্বীয় বিজয়রূপ দেখিলে তাহারা সম্মুখে আসিতে উৎসাহিত হইবে এবং ধীরে ধীরে তাহারা নিঃশেষ হইতে থাকিবে, যেরূপ মক্কাবাসী কাফের শত্রুদের অবস্থা ঘটিয়াছিল।

(৫) সংগ্রাম ও ধৈর্য্যের পরিচয় দানে বেহেশত লাভের উপযোগী হওয়া; কারণ, কষ্ট বিনে মিষ্ট লাভ হয় না।

(৬) মোসলমানগণ পূর্বাহ্নে যেই জিনিসের আকাঙ্খা করিতে ছিলেন তথা শাহাদতের মৃত্যু, সেই বস্তু তাহাদের সম্মুখে আনিয়া দেওয়া।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা জেহাদে শহীদ হওয়ার ফজিলত বর্ণনা করিয়াছেন—

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا - بَلْ اَحْيَاءٌ .....

অর্থ—যাঁহারা আল্লার রাস্তায় প্রাণ দান করিয়াছেন তাঁহাদিগকে মৃত গণ্য করিও না, তাঁহারা জীবিত, আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভকারী, তাঁহারা (বিশেষ রূপে নানারকম) নেয়ামত উপভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহারা আল্লার প্রতিদানের উপর অতিব সন্তুষ্ট, এমনকি যে সমস্ত ভাই-বেরাদর (জাগতিক জীবনে রহিয়া গিয়াছেন—) তাঁহাদের সঙ্গে এখনও মিলিত হয় নাই তাহাদের সম্পর্কে তাঁহারা এই ভাবিয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন যে, (আমাদের ন্যায় তাহারাও শাহাদৎ বরণ করিলে) তাহাদের জন্য কোন ভয় ও চিন্তার কারণ থাকিবে না। (৪ পাঃ ৭ রুঃ)

(৭) রসুলের আদেশ-নিষেধ লঙ্ঘনে যে কি অমঙ্গল নামিয়া আসে তাহার প্রত্যক্ষ নমুনা দেখাইয়া এবং ফল ভোগাইয়া মোসলেম জাতিকে চিরকালের জন্য সতর্কতা শিক্ষা দেওয়া। ওহোদ-রণাঙ্গনে বিজয় ত মোসলমানদের করতলে আসিয়া গিয়াছিল, কিন্তু রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করার ফলেই সেই বিজয় তাঁহাদের

হইতে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল। আল্লাহ তায়ালার কালামে এই বিষয়টির প্রতিও ইঙ্গিত রহিয়াছে—

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

"যখন তোমাদের উপর আঘাত লাগিল যে আঘাতের দ্বিগুণ আঘাত তোমরা শত্রুকে লাগাইতে সক্ষম হইয়াছিলে তখন উৎকণ্ঠিত স্বরে তোমরা বলিতে লাগিলে, এই বিপদ আমাদের উপর কোথা হইতে—কেন আসিল? (আমরা ত মোসলমান; বেদীনদের হাতে আমরা কেন আঘাত খাইলাম।) আপনি বলিয়া দিন, এই আঘাত তোমাদের উপর তোমাদের পক্ষ হইতেই—তোমাদের কারণেই লাগিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা সব রকম শক্তিই রাখেন।" (৪ পারা ৮ রুকু)

ওহোদ-রণাঙ্গনে মক্কার কাফের বাহিনীর হাতে মোসলমান সত্তর জন শহীদ হইয়া ছিলেন; তাহাদের হাতে কেহ বন্দী হইয়া ছিলেন না। ইতিপূর্বে বদর রণাঙ্গনে মোসলমানদের হাতে ঐ কাফের বাহিনীর সত্তর জন নিহত হইয়াছিল এবং সত্তর জন বন্দী হইয়াছিল।

ক্ষয়-ক্ষতির উক্ত অনুপাত স্মরণ করাইয়া আল্লাহ তায়ালা বুঝাইতেছেন—বদর রণাঙ্গনেও তোমাদের রণসম্ভার ও সৈন্য সংখ্যা শত্রু বাহিনীর তুলনায় নগণ্যই ছিল, তবুও তোমরা শত্রুকে দ্বিগুণ আঘাত হানিতে এবং পর্যুদস্ত করিতে সক্ষম হইয়া ছিলে। আর সেই শত্রুর হাতেই তোমরা আজ তোমাদের বাড়ীর নিকটে ওহোদ-রণাঙ্গনে আঘাত খাইয়া গেলে! এখন নিজেরাই স্তম্ভিত হইতেছ, উৎকণ্ঠিত হইতেছ যে, আমাদের উপর আঘাত কেন লাগিল? শুনিয়া রাখ—তোমাদের উপর আঘাত তোমাদেরই ত্রুটির দরুন লাগিয়াছে। তোমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছিলে, ফলে মুহূর্তের মধ্যে বিপরিত অবস্থা সৃষ্টি হইয়া এই আঘাতের সূচনা হইয়াছে।

এই সতর্ককরণ বিশ্ব-মোসলেমের প্রতি কেয়ামত পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

(৮) মোসলমানদেরকে অতি প্রয়োজনীয় একটি ট্রেনিং ও শিক্ষা দেওয়া। সর্বদা বিজয়ই বিজয় কোন মানুষের বা কোন জাতির ভাগ্যেই জুটে না। জয়-পরাজয়, সুখ-দুঃখ বিপদ-সম্পদ ও উত্থান-পতন উভয়ই জাগতিক জীবনে অবশ্যম্ভাবী—ইহাই ইহ-জগতের স্বভাব; সুতরাং উভয়ের মধ্য দিয়াই মানুষ বা জাতির গঠন সম্পূর্ণ হয়।

দুঃখে-দুর্দিনে, পরাজয় ও ভাগ্যবিপর্য্যয়ের দিনে হুঁশহারা হইয়া হাত পা ছাড়িয়া দিলে চলিবে না, আত্মস্থ থাকিতে হইবে। বিপদে অধীর ও ব্যাকুল হইলে চলিবে না, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত বিপদ কাটাইয়া উঠায় অগ্রসর হইতে হইবে। পতনের সম্মুখে উত্থানের প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখিতে হইবে—এই সব ট্রেনিং ও শিক্ষা মানুষ বা জাতি

গঠনের জন্য কতনা প্রয়োজন। মোসলেম জাতির জন্য এই প্রয়োজনই ওহোদের রণাঙ্গনে নিষ্পন্ন করা হইয়া ছিল। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এই বিষয়ের ইঙ্গিত দানে বলিয়াছেন—

فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ

(ওহোদ রণাঙ্গনে তোমরা ত্রুটি করিয়াছ;) যদ্দরুন আল্লাহ তোমাদিগকে প্রতিফল ভোগাইলেন—দুঃখের উপর দুঃখ, ভাবনার উপর ভাবনা; তোমরা যেন সম্মুখ জীবনে হতাশ ও নিরাশ না হও—না লাভ ছুটিয়া যাওয়ায়, না বিপদ আসিয়া যাওয়ায়।" (৪পাঃ ৭রুঃ)

ওহোদ-রণাঙ্গনে মোসলমানগণ বিপদগ্রস্ত হইয়া ছিল, দুঃখ দুর্দশায় বেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছিল। তদুপরি বিজয় তাহাদের হাতের মুঠার মধ্যে আসিয়া যাওয়ার পর তাহারা উহা হইতে বঞ্চিত হইয়া বিপর্য্যয়ের বানে ডুবিয়া ছিল—এই দুর্ভাবনা এবং মনোব্যাথাও ছিল পাহাড় তুল্য। উল্লিখিত আয়াতে এই সব অবস্থাকেই "দুঃখের উপর দুঃখ, ভাবনার উপর ভাবনা" বলিয়া মোসলমানগণকে এই সবের সম্মুখীন করার উদ্দেশ্যরূপে আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন, দুঃখ-দুর্দশা, ভাবনা-চিন্তা ও শোক-বিয়োগে ভাঙ্গা করিয়া তোমাদিগকে পাকা-পোক্তা করা উদ্দেশ্য ছিল। একবার ভোগ করিয়া সম্মুখ জীবনে শত বার সহ্য করার সাহস ও বল তোমাদের অর্জিত হয়—এই উদ্দেশ্যেই তোমাদিগকে ঐ সব অবস্থার সম্মুখীন করা হইয়াছিল। গঠনোন্মুখ জাতির মধ্যে উক্ত সাহস ও বলের সঞ্চার বিশেষ প্রয়োজন; যেন বিপদ-সঙ্কুল পথে শত ভয়-ভীতিকে পদদলিত করিয়া অগ্রাভিযানে দৃঢ়পদ থাকিতে পারে। এই শ্রেণীর শিক্ষা মোসলমানগণ সর্বপ্রথম ওহোদ-ক্ষেত্রেই লাভ করিয়া ছিলেন।

উক্ত শিক্ষার অতি সুন্দর নমুনা ও দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন নবীজী (দঃ) এই ওহোদ-রণাঙ্গনে। সঙ্কট মুহূর্তে বিচলিত না হইয়া দৃঢ়পদ থাকা, মৃত্যুর মুখামুখী দাঁড়াইয়াও কর্তব্যরত থাকা, মৃত্যুকে শুধু ইঞ্চি ব্যবধানে দেখিয়াও উদ্দেশ্যের লক্ষ্য ত্যাগ না করা—ইত্যাদি গুণাবলীর অতুলনীয় আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন নবীজী (দঃ) ঐ দিন। মৃত্যুর বাহন শত শত তীর বর্শা বেষ্টনকারীরূপে নবীজীর প্রতি ছুটিয়া আসিতেছিল, দাঁত ভাঙ্গা মুখ হইতে এবং হাঁড় ভাঙ্গা মাথা হইতে রক্ত ঝরিতেছিল, আঘাত জনিত দেহের উপর আঘাত লাগিতেছিল, নবীজীর জীবন রক্ষায় ভক্তগণ তাঁহার সম্মুখে ভূলুণ্ঠিত হইতেছিলেন—এই অবস্থায়ও মৃত্যুর পরওয়া না করিয়া রণাঙ্গন আঁকড়াইয়া রহিয়াছেন, মুহূর্তের জন্যও রণাঙ্গন হইতে পশ্চাদপদ হন নাই। মৃত্যুর বেষ্টনীতে থাকিয়াও হযরত (দঃ) বিক্ষিপ্ত মোসলেম সৈনিকদিগকে একত্রিত করার ডাক ছাড়িতে ছিলেন। পবিত্র কোরআনের ভাষায় এই দৃশ্যের বর্ণনা—

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ

"ঐ ভয়াবহ মুহূর্তকে স্মরণ কর—যখন তোমরা ছিন্ন-ভিন্নরূপে ছুটাছুটি করিতে ছিলে, কেউ কাহারও প্রতি ফিরিয়া তাকাইতেও ছিলে না; আর রসুল (দঃ) পেছন হইতে তোমাদিগকে ডাকিতেছিলেন। (৪ পাঃ ৭ রুঃ)

আদর্শকে জয়যুক্ত করার চেষ্টায় মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়াইয়াও কিরূপ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে হয়, দ্বীন-ইসলামের জন্য জীবন-মরণ সংগ্রামে কি পরিমাণ ত্যাগ তিতিক্ষার এবং আল্লার উপর ভরসা-বিশ্বাস ও ঈমানের প্রয়োজন হয় তাহারই চাক্ষুস দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন নবীজী (দঃ) ঐদিন মোসলেম জাতিকে।

(৯) ছাহাবীগণের ন্যায় অতুলনীয় ভক্তবৃন্দকে একটি বিশেষ সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হইবে একদিন; সেই দিনে তাঁহাদের কর্তব্য কি হইবে সেই কর্তব্য পালন করিয়া দেখাইবার বা উহার শিক্ষা লওয়ার সুযোগ হইয়াছিল ওহোদ-রণাঙ্গনের ঘটনার অংশ বিশেষে।

নবীজী (দঃ) অমর হইয়া দুনিয়াতে আসিয়াছিলেন না, ছাহাবীগণের ন্যায় ভক্তবৃন্দের উপর দ্বীন-ইসলামের বোঝা ন্যস্ত করিয়া তাঁহাদের সামনেই তাঁহার তিরোধান হইবে একদিন—এই দিনটি অবশ্যই ছাহাবীগণের সম্মুখে আসিবে। এই দুর্বিসহ শোককে তাঁহারা কোন্ আলোকে গ্রহণ করিবেন—বিহ্বলরূপে হাত-পা ছাড়িয়া অসাড়-অচেতন হইয়া পড়িবেন বা উদভ্রান্ত হইয়া পথত্যাগী হইবেন, না—অক্ষুণ্ণ মনোবলের সহিত তাঁহারই পথে অগ্রাভিযান রাখিবেন? এই পরীক্ষাও দিতে হইয়াছিল ছাহাবীগণকে ওহোদ-প্রাঙ্গণে।

হঠাৎ গুজাব—قُتِلَ مُحَمَّدٌ "মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) নিহত হইয়াছেন।" কিছু সংখ্যক ছাহাবী এই দুঃসংবাদেও কর্তব্যচ্যুত না হইয়া, বরং অধিক দুর্বার গতিতে অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখিলেন—যেমন, আনাছ ইবনে নজর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। আর কিছু সংখ্যক, এমনকি লৌহ মানব ওমর (রাঃ) পর্য্যন্ত শোকে বিহ্বল হইয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহাদের শিক্ষা দানে কোরআনের সুদীর্ঘ কটাক্ষপাতের আয়াত নাযেল হইল—

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ .....

"মোহাম্মদ ত একজন রসুল; (খোদা নহেন, যে অমর হইবেন।) তাঁহার পূর্বে অনেক রসুলের মৃত্যু ঘটিয়াছে। তাঁহারও যদি মৃত্যু ঘটিয়া যায় অথবা নিহতই হইয়া যান তোমরা কি তবে পশ্চাদ পথে ফিরিয়া যাইবে? পশ্চাদ পথে যে ফিরিয়া যাইবে সে (নিজেরই ক্ষতি করিবে;) আল্লার কোন ক্ষতি করিবে না। আল্লাহ কৃতজ্ঞদিগকে অচিরেই প্রতিদান দিবেন। কোন প্রাণীর মৃত্যু হয় না আল্লার হুকুম ছাড়া, আল্লাহ কর্তৃক নির্দ্ধারিত সময় ছাড়া।" (৪ পাঃ ৬ রুঃ)

এই শিক্ষার কি স্বর্ণ ফল যে, ফলিয়াছিল তাহার নমুনা ইতিহাসে পাওয়া যায়। যেদিন সত্যিই নবীজীর মৃত্যু ঘটিল ঐদিন ছাহাবীগণের উপর বিহ্বলতার যে কাল ছায়া নামিয়া আসিয়াছিল উহা বর্ণনাতীত। সকলেই অসাড়-অচেতন। আবু বকর (রাঃ) নবজীর মসজিদে সকলকে একত্রিত করিয়া নবীজীর মৃত্যু ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে উল্লিখিত আয়াত পাঠ করিলেন। উক্ত আয়াত শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে সকলের নব চেতনার উদয় হইল। এমনকি উক্ত আয়াত মুখে লইয়া সকলে মসজিদ হইতে বাহির হইলেন এবং মদীনার গলিতে গলিতে তাঁহারা ছড়াইয়া পড়িলেন; সারা মদীনা শহর উক্ত আয়াতের শব্দে গুঞ্জনিত হইয়া উঠিল। শোকাভিভূত বিহ্বল অচেতন মদীনার মোসলেম সমাজ উক্ত আয়াতের শিক্ষা ও আদর্শে নূতন প্রেরণা লাভ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কর্মতৎপরতার নবরূপ উদ্যম উৎসাহ পরিলক্ষিত হইল; ফলে আভ্যন্তরীণ মোনাফেক শত্রু এবং বিভিন্ন দিকের বহিশর্ত্রুরা হযরতের তিরোধানে যেই সুযোগের আশা করিতেছিল তাহাদের সেই আশার উপর ছাই পড়িয়া গেল। মোসলমানগণ আবু বকর (রাঃ) খলীফার নেতৃত্বে ভিতর-বাহিরের শত্রু দমনে পুরাদমে উৎসাহ উদ্দীপনার সহিত অভিযান চালাইলেন। অচিরেই হযরতের তিরোধান লগ্নে সৃষ্ট সমুদয় গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটিল। বিস্তারিত বিবরণ পঞ্চম খণ্ডে পাঠ করিবেন।

ঐ স্বাভাবিক অবধারিত সঙ্কট সময়ে এই স্বর্ণফল ওহোদ-ঘটনায় প্রদত্ত শিক্ষা ও সেই উপলক্ষের আয়াত—কোরআনের বাণীর দ্বারাই লাভ হওয়া সম্ভব হইয়াছিল।

জয়, না—পরাজয়?

মোসলমানগণ ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহাকে পরাজয় বলা যায় না, বরং বে-কায়দায় পতিত হওয়ায় সত্তর জন সৈনিকের জীবন ক্ষয় হইয়াছিল মাত্র। কাফেরদের আটাশ জন বরং আরও অধিক নিহত হইয়াছিল।

বদরের যুদ্ধে মোসলমানদের চৌদ্দজনের মোকাবিলায় কাফেরদের সত্তরজন নিহত হইয়াছিল। কিন্তু বদরের যুদ্ধে শত্রু সেনা কাফেরগণের সত্তর জন বন্দিও হইয়াছিল। ওহোদের যুদ্ধে কোন মোসলমান কাফেরদের হস্তে বন্দী হন নাই। আবু সুফিয়ান মক্কায় পৌঁছিয়া জয়ের দম্ভ করিলে পর তাহার জাতীয় লোক মধ্য হইতেই কেহ কেহ তাহার প্রতি এই তিরস্কার করিয়াছিল যে, তোমরা জয়ী হইয়া থাকিলে তোমাদের হস্তে কোন বন্দী নাই কেন?

সর্বোপরি জয়-পরাজয়ের মূল নিদর্শন—এক পক্ষের রণাঙ্গন পরিত্যাগ করা—ইহা বদরের যুদ্ধে কাফেরদের পক্ষে স্পষ্টতর বিদ্যমান ছিল। কারণ, তখন অবশিষ্ট কাফেররা রণাঙ্গন হইতে পলায়ন করিয়াছিল, তাহাদের পলায়নের পরও হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় দলবল সহ বিজয় গৌরবের সহিত তথায় তিন দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে ওহোদের

যুদ্ধে মোসলমানগণ মুহূর্ত পূর্বেও প্রথমে রণাঙ্গন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন না, বরং মোসলমানদের দলপতি রসুলুল্লাহ (দঃ) রণাঙ্গনে স্বয়ং বিদ্যমান ছিলেন এবং বিশিষ্ট বিশিষ্ট ছাহাবীগণ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ চালাইতে ছিলেন। কতিপয় ছাহাবী বিহ্বল অবস্থায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া ছিলেন তাঁহারাও হযরত জীবিত আছেন এই সুসংবাদ শুনা মাত্র বিজলী-গতিতে ছুটিয়া আসিয়া হযরতের নিকট একত্রিত হইয়াছিলেন। যে যেখানে ছিলেন সকলেই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া ছিলেন।

হাদীছে বর্ণিত আছে, কায়া'ব ইবনে মালেক (রাঃ) ছাহাবী সর্বপ্রথম রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন—

يا معشر المسلمين ابشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم -

"হে মোসলমানগণ! সুসংবাদ গ্রহণ কর—ঐ দেখ, রসুলুল্লাহ (দঃ)।" মোসলমানদের কানে এই শব্দ পৌঁছা মাত্র বিজলী-গতিতে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহারা সমবেত হইলেন; যেরূপ গাভীর বাছুর মায়ের ডাকে ছুটিয়া আসে।

এইরূপে মোসলমাগণ একত্রিত হইয়া সমবেতভাবে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতঃ আক্রমণ প্রতিহত করাই নয় শুধু, বরং নব উদ্যমে আক্রমণ চালাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। তখন মোসলমানদের কিরূপ দৃঢ় মনোবলের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় ১৪৪০ নং হাদীছে বর্ণিত কাফের দলপতি আবু সুফিয়ানের মন্তব্যের প্রতিউত্তরে ওমর (রাঃ) যে কঠোর উক্তি করিয়াছিলেন এবং তাহার মুখের উপর যে সব শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন উহার দ্বারা পাওয়া যায়। পরাজিত দলের পক্ষে বিজয়ী দলের দলপতির প্রতি এইরূপ উক্তি প্রয়োগ সম্ভব হয় না এবং কোন বিজয়ী দল তাহা সহ্যও করিতে পারে না। সেই পরিস্থিতিতে আবু ফুফিয়ান নানা প্রকার বিজয় ধ্বনি দিয়াছিল, কিন্তু মোসলমানগণ প্রতিউত্তরে স্বতঃস্ফূর্ত বিজয়-ধ্বনি দ্বারা তাহাদের ধ্বনিকে বিলীন করিয়া দেন। আবু সুফিয়ান মোসলমানদের মনোবল দেখিয়া স্বীয় বিজয়ের ভুল ধারণার অসাড়তা উপলব্ধি করিতে পারিল এবং উপস্থিত মুখ রক্ষার জন্য আগামী বৎসর বদরের ময়দানে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ দিল। মোসলমানগণ বীরত্বের সহিত তাহার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিলেন। আবু সুফিয়ান দলবল সহ রণাঙ্গন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

রসুলুল্লাহ (দঃ) এখনও স্বদলবলে রণাঙ্গনে বিদ্যমান। বরং বহু সময় তথায় অতিবাহিত করিলেন, সমস্ত শহীদানের দাফন-কাফন তথায়ই সমাধা করা হইল।

মোসলমানগণ যদি পরাজিতই হইবে তবে কোরেশরা মদীনা শহর আক্রমণ করিল না কেন? মদীনার শহরতলী ওহোদ প্রান্ত হইতে মক্কায় ফিরিয়া গেল কেন? সর্বপরি কথা এই যে, পর বৎসর বদর প্রান্তরে আবার যুদ্ধ হইবে—আবু সুফিয়ানের এই আস্ফালন তাহাদের পক্ষে কার্য্যে পরিণত হইল না কেন? অথচ মোসলমানগণ তথায় উপস্থিত হইয়াছিল!

শহীদানের কাফন-দাফন :

১৪৫৭। **হাদীছ :**—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ওহোদের জেহাদের দিন দুই দুই ব্যক্তিকে এক একটি চাদরের নীচে রাখিয়া দাফন করিয়াছিলেন। তিনি দুই দুই জন একত্রে করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, ইহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি অধিক পরিমাণ কোরআন শরীফের শিক্ষা লাভ করিয়াছিল? যখন সেই অনুযায়ী একজন নির্দিষ্ট করা হইত, তখন তিনি তাহাকেই প্রথমে কবরে রাখিতেন। (এইরূপে নিজ তত্ত্বাবধানে সকলকে সেই ময়দানেই সমাহিত করিয়া) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, এই সকল ব্যক্তিবর্গের জন্য আমি কেয়ামতের দিন (আল্লার দরবারে) সাক্ষ্য প্রদান করিব।

রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ সকল শহীদানকে রক্তাক্তাবস্থায় দাফন করিলেন। তাঁহাদের উপর জানাযার নামায পড়িলেন না এবং তাঁহাদিগকে গোসলও দিলেন না।

ব্যাখ্যা :— শবদেহের আধিক্য; সত্তরটি শবদেহ ছিল। এতগুলি কবর খনন করা বিশেষতঃ যখন সকলেই আহত, শ্রান্ত ও ক্লান্ত ছিলেন সহজ কার্য্য ছিল না। তাই এক একটি কবর অধিক প্রশস্ত করিয়া উহাতে একাধিক শবদেহ দাফন করা হয়।

কাফনের কাপড়ের সল্পতা ছিল, তাই নিয়মিত কাফন দান সম্ভব হয় নাই—এক একটি চাদরে একাধিক শবদেহ আবৃত করিয়া দেওয়া হয়।

সকল ইমামগণের ঐক্যমত্যপূর্ণ মাছআলা এই যে, আল্লার রাস্তায় জেহাদে শাহাদৎ বরণকারীকে তাঁহার রক্তাক্তদেহে ও রক্তাক্ত কাপড়-চোপড়ে দাফন করিতে হইবে তাঁহাকে গোসল প্রদান করা হইবে না। সেমতেই খুন-রঙ্গীন লেবাছে ওহোদের ময়দানে জেহাদকারী বীর শহীদানগণ শেষ শয়ন গ্রহণ করিলেন।

শহীদের প্রতি জানাযার নামায সম্পর্কে কোন কোন ইমামের মত এই যে, শহীদের প্রতি জানাযার নামায পড়িতে হইবে না। তাঁহারা আলোচ্য হাদীছকে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করিয়া থাকেন। ইমাম আবু হানিফার মত এই যে, শহীদের প্রতি জানাযার নামায পড়া হইবে। রসুলুল্লাহ (দঃ) ওহোদের জেহাদে শহীদানের উপর জানাযার নামায পড়িয়াছিলেন বলিয়া কতিপয় হাদীছ অন্যান্য কেতাবে বর্ণিত আছে। অবশ্য সংক্ষেপ করণার্থে দশ দশ জনের জানাযা একত্রে পড়িয়াছিলেন; প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পড়িয়াছিলেন না; সেই বিষয়টিকেই আলোচ্য হাদীছে জানাযার নামায পড়েন নাই বলা হইয়াছে।

১৪৫৮। **হাদীছ :**—খাব্বাব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে হিজরত করতঃ স্বীয় দেশ-খেশ সর্বস্ব পরিত্যাগ করি। আল্লাহ তায়ালার নিকট আমাদের এই মহাত্যাগের ছওয়াব

স্থির ও সাব্যস্ত হয়। অতঃপর আমাদের মধ্যে কেহ কেহ দুনিয়া হইতে এইরূপ অবস্থায় বিদায় গ্রহণ করেন যে, ইহজগতে ঐ মহাত্যাগের কোন প্রতিফলই ভোগ করেন নাই; মোছয়া'ব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি ওহোদের যুদ্ধে শাহদাৎ বরণ করিয়াছিলেন। একটি মাত্র সাধারণ কম্বল ব্যতীত আর কোন কিছু পরিত্যক্ত সম্পদ স্বরূপ রাখিয়া যান নাই, এমনকি কাফনের জন্য আর কোন ব্যবস্থা না থাকায় ঐ কম্বল দ্বারাই তাঁহার কাফন দেওয়া হয়। কম্বলটির দৈর্ঘ্য কম ছিল—উহার দ্বারা মাথা ঢাকিলে পা খুলিয়া যাইত। হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তখন বলিলেন, কম্বল দ্বারা মাথা ঢাকিয়া দাও এবং এজখের (নামক ঘাস) দ্বারা পা আবৃত করিয়া দাও।

আমাদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক এমনও আছেন যাহারা (ইহজগতেই) স্বীয় আমলের বৃক্ষে ফল পাকিবার সুযোগ পাইয়াছেন এবং উহা ভোগ করিতেছেন।

ব্যাখ্যা:—ইসলাম শক্তিশালী ও উন্নত হওয়ার পর জেহাদের মাধ্যমে ছাহাবীগণ ইসলাম ও হিজরতের অছিলায় সচ্ছলতা ও সুখ-শান্তি লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন, সেই সুযোগকেই বৃক্ষের ফল পাকিবার সুযোগপ্রাপ্তি বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে। অবশ্য এই সুযোগ দ্বারা ইসলামের ও হিজরতের ছওয়াব কম হইয়া যাইবে না, কিন্তু যাঁহারা এই সুযোগ পান নাই, বরং দুনিয়াকে অস্থায়ী মনে করতঃ নিছক অস্থায়ীরূপেই স্বেচ্ছায় কিম্বা সুযোগ না পাইয়া কষ্ট-ক্লেশের জেন্দেগী অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট তাঁহারা কষ্ট-ক্লেশের অতিরিক্ত প্রতিদান ও প্রতিফল নিশ্চয় লাভ করিবেন। উল্লিখিত হাদীছে উহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে।

মোসলমানগণের অক্ষুন্ন মনোবল—

ওহোদের ঘটনায় মোসলমানগণ ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মনোবল অক্ষুন্ন ছিল। তাঁহাদের অন্তরে বিন্দুমাত্র দুর্বলতা আসিয়া ছিল না এবং তাঁহাদের সাহসিকতারও কোন পরিবর্তন ঘটে নাই।

১৪৫৯। হাদীছ:—আয়েশা (রাঃ) এই আয়াতটি তেলাওয়াত করিলেন—

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ.....

"যাহারা ক্ষত-বিক্ষত হইয়াও আল্লাহ এবং রসুলের আহ্বানে সাড়া দিলেন তাঁহাদের জন্য খাঁটি ও মোত্তাকীদের জন্য বড় প্রতিদান রহিয়াছে।" (৪ পাঃ ৯ রুঃ)

আয়েশা (রাঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করতঃ স্বীয় ভাগিনা ওরওয়া (রঃ)কে বলিলেন, তোমার পিতা যোবায়ের (রাঃ) এবং নানা আবু বকর (রাঃ) উল্লিখিত লোকদের মধ্যে ছিলেন।

● রসুলুল্লাহ (দঃ) ওহোদের রণাঙ্গনে বহু ক্ষয়-ক্ষতি ও দুঃখ-যাতনার সম্মুখীন হইলেন। শত্রুসেনা মোশরেকরা রণাঙ্গন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) (নানাপ্রকার সংবাদের দরুণ) আশঙ্কা করিলেন যে, শত্রুদল পুনঃ আক্রমণ চালাইতে পারে। শত্রুদলের সম্ভাব্য পুনঃ আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য হযরত (দঃ) আহ্বান জানাইলেন। তৎক্ষণাৎ সত্তর জন ছাহাবী সেই আহ্বানে সাড়া দিলেন, তন্মধ্যে আবু বকর (রাঃ) এবং যোবায়ের (রাঃ)ও ছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—ইহা একটি ভিন্ন অভিযান ছিল; শনিবার দিন ওহোদের জেহাদ হইল, শেষ বেলা হযরত (দঃ) মদীনা শহরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। রবিবার দিন ফজর নামাযের পূর্বেই হযরত (দঃ) সংবাদ পাইলেন, ওহোদ হইতে প্রস্থানকারী শত্রুদল পুনঃ মদীনার উপর আক্রমণের দ্বারা মোসলমান জাতিকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করা সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছে। হযরত (দঃ) আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)কে ঐ সংবাদ জ্ঞাত করিলেন। তাঁহারা এই পরামর্শই দিলেন যে, সম্মুখে অগ্রসর হইয়া শত্রুদের প্রতিরোধ করা আবশ্যক। ফজর নামাযান্তে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সকলকে আহ্বান জানাইলেন এবং ইহাও প্রচার করিয়া দিলেন যে, গতকল্য ওহোদের রণাঙ্গনে যাহারা অংশগ্রহণ করিয়াছিল একমাত্র তাহারাই এই অভিযানে যাইবে।

উপস্থিত ঐ মজলিসেই সত্তর জন প্রস্তুত হইলেন, এতদ্ভিন্ন ওহোদের জেহাদে অংশ-গ্রহণকারী অবশিষ্ট সকলেই প্রস্তুত হইলেন। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং তাঁহাদের নেতৃত্ব দানে যাত্রা করিলেন এবং মদীনা হইতে আট মাইল দূরে অবস্থিত "হামরাউল-আসাদ" নামক স্থানে যাইয়া অবস্থান করিলেন। তথায় তিনি সোম, মঙ্গল, বুধ পূর্ণ তিন দিন অবস্থান করতঃ বৃহস্পতিবার তথা হইতে যাত্রা করিয়া শুক্রবার মদীনায় পৌঁছিলেন। কাফের শত্রুদল পুনঃ আক্রমণের শুধু আলাপ-আলোচনাই করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতে অনেকে বিপরীত পরামর্শও দান করিল। এতদ্ভিন্ন তাহারা মোসলমানদের অক্ষুণ্ন মনোবল এবং উৎসাহ উদ্দীপনাময় অভিযানের সংবাদে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া চলিয়া গেল।

ওহোদ-রণাঙ্গনের ক্ষয়-ক্ষতির শোকে সদ্য শোকাভিভূত এবং রক্তাক্ত ও আঘাতে জর্জরিত অবস্থায় ছাহাবীগণ পুনঃ জেহাদের যে, উৎসাহ-উদ্দীপনার শুধু পরিচয়ই দিলেন না, বরং কার্য্যক্ষেত্রে ঝাপাইয়া পড়িলেন সেই অপরূপ দৃশ্যের প্রেক্ষিতেই ছাহাবীগণের গুণগান ও সুসংবাদ দানে উপরোল্লিখিত আয়াত নাযেল হইয়াছিল।

ওহোদের জেহাদের ফলাফল সম্পর্কে রসুলুল্লার স্বপ্ন ঃ

১৪৬০। হাদীছ ঃ— আবু মুছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি স্বপ্নের মধ্যে দেখিয়াছিলাম যে, আমি আমার তরবারিটি নাড়া দিলাম, উহা মধ্যস্থলে ভাঙ্গিয়া গেল; (এখন আমি বুঝিতে পারিলাম,) উহা ওহোদ

রণাঙ্গনে মোসলমানদের উপর আগত বিপদের প্রতিচ্ছবি ছিল। (আমি আরও দেখিয়াছিলাম যে,) অতঃপর আমি তরবারিটিকে পুনঃ নাড়া দিলাম, উহা অতি সুন্দর সুশ্রী হইয়া গেল; মোসলমানগণ যে পরমুহূর্তে একত্রিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইল এবং জয় তাহাদেরই রহিল তাহাই অর্থ ছিল স্বপ্নের এই অংশের।

আমি স্বপ্নের মধ্যে ইহাও দেখিয়াছিলাম যে, একটি গরু জবেহ করা হইল এবং স্বপ্নের মধ্যেই ইহাও জ্ঞাত হইলাম যে, আল্লাহ তায়ালার প্রতিদান অতি উত্তম। গরু জবেহ হওয়ার অর্থ ছিল—মোসলমানগণের শাহাদৎ বরণ করা এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতিদান উত্তম হওয়ার অর্থ ছিল—পরবর্তীকালে মোসলমানদের খাঁটী ও নিষ্ঠাবানরূপে কার্য্য করার তৌফিক এবং সাহস ও মনোবল যে শুভ প্রতিদান আল্লাহ তায়ালা দান করিয়াছেন, বিশেষতঃ দ্বিতীয় বদরের অভিযান উপলক্ষে।

ব্যাখ্যা:—দ্বিতীয় বদরের অভিযান ওহোদের পরবর্তী বৎসর চতুর্থ হিজরী সনে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, ওহোদের ময়দান পরিত্যাগের পূর্বে কাফের দলপতি আবু সুফিয়ান গর্বভরে এই বলিয়া গিয়াছিল যে, বদরের ময়দানে আগামী বৎসর পুনরায় যুদ্ধের জন্য তোমাদিগকে তারিখ দিয়া যাইতেছি। তখন মোসলমানগণ স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, আমরা সেই তারিখ আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলাম।

নির্দ্ধারিত সময় নিকটবর্তী হইয়া আসিলে পর মক্কাবাসী কাফেরগণ মোসলমানদের মনোবল নষ্ট করার জন্য তদবীর করিয়াছিল, কিন্তু তাহা কার্য্যকরী হয় নাই। "নোয়ায়েম ইবনে মসউদ" নামক এক সওদাগর বাণিজ্য উপলক্ষে মক্কায় আসিয়াছিল, আবু সুফিয়ান তাহাকে উৎকোচ প্রদান করিয়া বলিল, তুমি মদীনায় যাইয়া মোসলমানদিগকে এই প্রোপাগাণ্ডার দ্বারা আতঙ্কিত করিও যে, মক্কাবাসীরা তোমাদের বিরুদ্ধে বহু সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র একত্র করিয়াছে। ঐ ব্যক্তি মদীনায় পৌঁছিয়া ঐরূপ প্রোপাগাণ্ডা ছড়াইল, কিন্তু কাফেরদের উদ্দেশ্যের বিপরীত মোসলমানগণ দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দানে বলিলেন, حسبنا الله ونعم الوكيل "আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং অতি উত্তম কার্যনির্বাহক।"

রসুলুল্লাহ (দঃ) পনর শত ছাহাবী সঙ্গে লইয়া নির্দ্ধারিত স্থান—বদরের ময়দানাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং তথায় পৌঁছিয়া আট দিন মক্কাবাসীদের অপেক্ষায় রহিলেন। আবু সুফিয়ান পঁচিশ শত সৈন্য সহ মক্কা হইতে যাত্রা করিল, কিন্তু মোসলমানদের দৃঢ় মনোবলের সংবাদে ভীত হইয়া পথিমধ্য হইতে ফিরিয়া গেল। যুদ্ধ হইল না; মোসলমানগণ বিনা রক্তপাতে ছওয়াবের ভাগী হইলেন, এতদ্ভিন্ন তথায় একটি বাণিজ্য মেলার উপলক্ষ ছিল, সেই মেলায় মোসলমানগণ ব্যবসা করিয়া বহু অর্থ উপার্জনের সুযোগ পাইলেন, এইরূপে মোসলমানগণ দ্বীন ও দুনিয়া উভয় রকমের দৌলত সঞ্চয় করতঃ মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। কোরআন শরীফে এই ঘটনার প্রতি নিম্ন আয়াতে ইঙ্গিত রহিয়াছে—

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ

اِيْمَانًا.....فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ -

অর্থ—(আল্লাহ তায়ালা মোসলমানদের প্রশংসা করিয়া বলেন,) যখন তাহাদিগকে এই সংবাদ দেওয়া হইল যে, (মক্কায়) লোকগণ তোমাদের বিরুদ্ধে বহু সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র সমাবেশ করিয়াছে তোমরা তাহাদিগকে ভয় কর; তখন এই সংবাদ তাহাদের ঈমানকে অধিক দৃঢ় করিয়া দিল এবং তাঁহারা বলিলেন, আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট ও উত্তম কার্যনির্বাহক। ফলে তাঁহারা বিনা কষ্টে আল্লার নেয়ামত ও করুণা লাভ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। (৪ পাঃ ৯ রুঃ)

ওহোদের জেহাদে আনছারগণের বিশেষ ভূমিকা ঃ

১৪৬১। **হাদীছ ঃ**—কাতাদাহ (রঃ) বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন শহীদরূপে আনছার—মদীনাবাসী ছাহাবীগণ অপেক্ষা কোন সম্প্রদায় অধিক সম্মানী হইবে না।

কাতাদাহ (রঃ) বলেন, ছাহাবী আনাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, ওহোদ জেহাদে সত্তর জন (শহীদের অধিকাংশ) তাঁহারাই ছিলেন, বীরে-মউনার ঘটনায় সত্তর জন শহীদ তাঁহারাই ছিলেন। ইয়ামামার জেহাদের সত্তর জন শহীদ তাঁহারাই ছিলেন; এই যুদ্ধ খলীফা আবু বকরের আমলে মিথ্যা নবী মোসায়লামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে হইয়াছিল। (৫৮৪ পৃঃ)

১৪৬২। **হাদীছ ঃ**—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওহোদ-জেহাদের দিন এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, সুনির্দিষ্টরূপে বলুনত—জেহাদে যদি আমি শহীদ হইয়া যাই তবে আমার স্থান কোথায় হইবে? নবী (দঃ) বলিলেন, বেহেশতে। ঐ সময় ঐ ব্যক্তির হাতে খুরমা ছিল যাহা সে খাইতে ছিল। উত্তর শুনা মাত্র সে হাতের খুরমাগুলি ফেলিয়া দিয়া জেহাদে অবতরণ করিল এবং শহীদ হইয়া গেল। (৫৭৯ পৃঃ)

১৪৬৩। **হাদীছ ঃ**—আনাছ ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার চাচা আনাছ ইবনে নজর (রাঃ) বদর-জেহাদে অনুপস্থিত ছিলেন; ইহাতে তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া বলিলেন, কাফের-মোশরেকদের সঙ্গে আপনার সর্বপ্রথম যে জেহাদ হইল আমি উহাতে অনুপস্থিত থাকিলাম। পুনরায় কাফের-মোশরেকদের সহিত জেহাদে যদি আল্লাহ তায়ালা উপস্থিতির সুযোগ দান করেন তবে আমি কি করি তাহা আল্লাহই দেখিবেন।

ওহোদের জেহাদে তিনি উপস্থিত ছিলেন। যখন মোসলমানদের শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া পড়িল, তখন তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ! মোসলমানগণ যে, ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে উহার জন্য

আমি অনুতাপ প্রকাশ করিতেছি, আর মোশরেকরা যে, সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে—উহার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই। এই কথা বলিয়া তিনি তরবারি লইয়া একাই সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। বিশিষ্ট ছাহাবী সায়াদ ইবনে মোয়াজ (রাঃ) তাঁহার সম্মুখে পড়িলেন। আনাছ ইবনে নজর (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, হে সায়াদ! কোথায় যাইতেছেন? বেহেশতের দিকে চলুন না কেন? আমি ত ওহোদ পর্বতের অদূরে বেহেশতের সুবাস পাইতেছি। এই কথা বলিয়া তিনি শত্রুদের উপর ঝাপাইয়া পড়িলেন। সায়াদ (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! তিনি যেরূপ করিলেন, সেরূপ করা আমার জন্য সম্ভবই হইল না।

আনাছ ইবনে মালেক (রাঃ) বলিয়াছেন, ঐ অবস্থায় তিনি শহীদ হইলেন। তাঁহার শরীরে তীর, বর্শা ও তরবারির আঘাত আশি সংখ্যার অধিক ছিল এবং মোশরেকরা তাঁহার নাক-কান ইত্যাদি অঙ্গসমূহ কাটিয়া ফেলিয়াছিল। তাঁহার দেহ এরূপ ক্ষতবিক্ষত ছিল যে, তাঁহাকে সনাক্ত করা যাইতেছিল না; তাঁহার ভগ্নি তাঁহার আঙ্গুলের একটি বিশেষ চিহ্ন দেখিয়া সনাক্ত করিতে পারিয়াছিলেন।

আনাছ ইবনে মালেক (রাঃ) আরও বলিয়াছেন, আমরা ছাহাবীগণ তাঁহার এবং তাঁহার শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কেই এই আয়াতের অবতরণ ধারণা করিয়া থাকিতাম—

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ

"মোমেনদের মধ্যে এমন লোকগণ আছেন যাঁহারা আল্লাহকে দেওয়া ওয়াদা পূর্ণ করায় সত্যবাদী প্রমাণিত হইয়াছেন।" (৫৭৯ পৃঃ)

এই হাদীছের সহিত আরও একখানা হাদীছ উল্লিখিত রহিয়াছে উহার অনুবাদ পঞ্চম খণ্ডে "ছাহাবীগণের ফজিলত" পরিচ্ছেদে আনাছ ইবনে নজর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বর্ণনায় আসিবে।

মৃত্যুকালে ওহোদের শহীদগণ হইতে রসুলুল্লার বিদায় গ্রহণ ঃ

প্রথম খণ্ডের ৬১৯ নং হাদীছে বর্ণিত রহিয়াছে, নবী (দঃ) মৃত্যু-শয্যার রোগ অবস্থায় একদা ওহোদের শহীদগণের সমাধিস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করিয়া মসজিদে প্রত্যাবর্তন পূর্বক মিম্বরে আরোহণ করিলেন এবং জীবিত মৃত সকল হইতে চিরবিদায় গ্রহণ স্বরূপ একটি ভাষণ দান করিলেন। বিস্তারিত বিবরণ ১ম খণ্ডে রহিয়াছে।

● ওহোদের জেহাদের পর দুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে—প্রথমটি "রাজী"-এর যুদ্ধ যাহাকে "আজল" ও "কারা" গোত্রের ঘটনা বলা হয়, দ্বিতীয়টি বীরে-মউনার যুদ্ধ যাহাকে "রেয়েল" ও "জাকওয়ান" গোত্রের ঘটনা বলা হয়।

রাজীর ঘটনা

তৃতীয় হিজরী সনের শেষ ভাগের ঘটনা—আজল ও কারা গোত্রদ্বয়ের কতিপয় ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া আরজ করিল, আমাদের এলাকায় অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে এবং অনেকে ইসলামের প্রতি আগ্রহান্বিত, তাই আপনার ছাহাবীগণের মধ্য হইতে কিছু সংখ্যক লোক তথায় দ্বীন-ইসলাম প্রচার ও শিক্ষাদানের জন্য প্রেরণ করুন। এদিকে পূর্ব হইতেই রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কাবাসী কোরায়েশ শত্রুদের গতিবিধি ও কার্যকলাপের গোপন খবর জ্ঞাত হওয়ার জন্য ঐ এলাকায় স্বীয় লোক প্রেরণের ইচ্ছাও করিতেছিলেন। এদতাবস্থায় ঐ এলাকার লোকদের পক্ষ হইতে উক্ত আগ্রহ প্রকাশ পাওয়া একটি শুভ সুযোগ ছিল, তাই হযরত (দঃ) বিশিষ্ট ছাহাবী আছেম ইবনে ছাবেত রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অধিনায়কত্বে ছয় জন ছাহাবীকে ঐ ব্যক্তিদের সঙ্গেই প্রেরণ করিলেন—(১) আছেম (রাঃ), (২) মারছাদ (রাঃ), (৩) খোবায়েব (রাঃ), (৪) যায়েদ ইবনে দাছেনা (রাঃ), (৫) আবদুল্লাহ ইবনে তারেক (রাঃ), (৬) খালেদ ইবনে বকর (রাঃ)। এতদ্ভিন্ন আরও চার জনকে তাঁহাদের সহচররূপে পাঠাইলেন, যাঁহাদের মধ্যে মোয়াত্তাব ইবনে ওবায়েদ (রাঃ)ও ছিলেন। সর্বমোট দশ জন ছাহাবীকে তথায় প্রেরণ করিলেন।

মক্কার নিকটস্থ "রাজী" নামক এলাকায় তাঁহারা পৌঁছিলে পর ঐ আহ্বানকারী প্রতিনিধি দলই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ছাহাবীগণের প্রাণ নাশের ষড়যন্ত্র করিল এবং ঐ এলাকাস্থিত "বনু-হোজায়েল" গোত্রের শাখা বনু-লেহ্ইয়ান গোত্রের লোকদিগকে লেলাইয়া দিল। তাহারা একশত তীরন্দাজ বাহিনীর সমভিব্যাহারে দুইশত লোক ছাহাবীগণের প্রতি ধাওয়া করিল। মুষ্টিমেয় দশ জন ছাহাবী ঐ দুইশত লোকের মোকাবিলায় সংগ্রাম চালাইলেন, কিন্তু তাঁহারা পরাস্ত হইলেন। বিস্তারিত ঘটনা নিম্নের হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

১৪৬৪। **হাদীছ ঃ**— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আছেম ইবনে ছাবেত রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নেতৃত্বে একটি গোপন খবর সরবরাহকারী দল এক এলাকায় প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা যখন মক্কা ও ওসফান নামক এলাকাদ্বয়ের মধ্যস্থিত স্থানে পৌঁছিলেন তখন উক্ত এলাকাস্থিত বনু-হোজায়েল গোত্রের শাখা বনু-লেহ্ইয়ান গোত্রের লোকদের নিকট তাঁহাদের সংবাদ প্রদান করা হইল। ঐ গোত্রীয় লোকগণ প্রায় শতাধিক তীরন্দাজ বাহিনীর সমভিব্যাহারে তাঁহাদের প্রতি ধাওয়া করিল। পথিমধ্যে যে স্থানে ছাহাবীগণ খেজুর খাইয়াছিলেন শত্রুদল তথায় পৌঁছিয়া পতিত খেজুরের দানাগুলিকে মদীনার খেজুরের দানারূপে লক্ষ্য করতঃ সন্ধান লাভ করিল যে, মোসলমানগণ এই পথেই গিয়াছে। তাহারা ঐ পথ ধরিয়া ছাহাবীগণের নিকটবর্তী আসিয়া পৌঁছিল। ছাহাবীগণ একটি টিলার উপর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শত্রুদল ঐ টিলাকে ঘেরাও করিয়া ফেলিল এবং ছাহাবীগণকে বলিল, আমরা তোমাদিগকে ওয়াদা ও অঙ্গীকার

প্রদান করিতেছি, যদি তোমরা স্বেচ্ছায় নামিয়া আস তবে আমরা তোমাদের কাহাকেও হত্যা করিব না। দলপতি আছেম (রাঃ) বলিলেন, আমি কোন কাফেরের অঙ্গিকারে নির্ভর করিয়া অবতরণ করিব না; এই বলিয়া তিনি দোয়া করিলেন, اللهم اخبر عنا رسولك "হে আল্লাহ! তোমার রসুলকে আমাদের অবস্থার সংবাদ পৌঁছাইয়া দাও।" অতঃপর ছাহাবীগণ শত্রুদের প্রতি আক্রমণ চালাইলেন। শত্রুদল তাঁহাদের উপর তীরবৃষ্টি বর্ষণ করিল; দলপতি আছেম (রাঃ) সহ তাঁহাদের সাতজন শাহাদত বরণ করিলেন, অবশিষ্ট তিনজন জীবিত রহিলেন—খোবায়েব (রাঃ), যায়েদ ইবনে দাছেনা (রাঃ) এবং তৃতীয় একজন (আবদুল্লাহ ইবনে তারেক (রাঃ)। তাঁহারা পরীক্ষামূলক ভাবে) শত্রুদলের অঙ্গিকার গ্রহণ পূর্বক নীচে অবতরণ করিয়া আসিলেন। শত্রুগণ যখন তাঁহাদের উপর কাবু করিয়া লইল তখন তাহারা স্বীয় ধনুকের তার দ্বারা তাঁহাদিগকে বাঁধিয়া ফেলিল। আবদুল্লাহ ইবনে তারেক (রাঃ) বলিলেন, তোমরা প্রথমেই অঙ্গিকার ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছ; এই বলিয়া তিনি তাহাদের সঙ্গে যাইতে অস্বীকার করিলেন। তাহারা তাঁহাকে টানা হেচরা করিল, কিন্তু সঙ্গে নিতে পারিল না। অবশেষে তাহারা তাঁহাকে শহীদ করিয়া ফেলিল। তারপর খোবায়েব (রাঃ) ও যায়েদ (রাঃ)কে বন্দীরূপে সঙ্গে লইয়া গেল। শত্রুদল তাঁহাদেরকে মক্কাবাসীদের হস্তে বিক্রি করিল।

খোবায়েব (রাঃ) বদরের জেহাদে হারেছ ইবনে আমের নামক মক্কাবাসী এক কাফেরকে হত্যা করিয়াছিলেন, সেই কাফেরের পুত্রগণ তাহাদের পিতার হত্যাকারী হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য খোবায়েব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে ক্রয় করিয়া নিল। খোবায়েব (রাঃ) তাহাদের নিকট বন্দীরূপে রহিলেন, অতঃপর তাহারা তাঁহাকে হত্যা করার দৃঢ় সঙ্কল্প করিল। তখন খোবায়েব (রাঃ) (স্বীয় পরওয়ারদেগারের প্রতি ছফরের প্রস্তুতি করিতে লাগিলেন—) তাহাদের নিকট হইতে একটি ক্ষৌর চাহিয়া লইলেন, সুন্নতরূপে পরিচ্ছন্নতা হাসিলের উদ্দেশ্যে। তাহাদেরই এক মহিলা বর্ণনা করিয়াছে যে, আমার একটি শিশু সন্তান আমার বে-খেয়ালিতে হাঁটিয়া খোবায়েবের নিকট চলিয়া গেল। খোবায়েব শিশুটিকে স্বীয় উরুর উপর বসাইয়া ক্ষৌর ধার দিতে ছিল; আমি (এই দৃশ্য দেখিয়া হতভম্ব হইয়া উঠিলাম—ভাবিলাম যে, খোবায়েব ভালরূপেই জানে, আমাদের হস্তে তাহার মৃত্যু অনিবার্য। তাই সে আমাদের ক্ষতি করার জন্য যদি শিশুটিকে ঐ ক্ষৌর দ্বারা হত্যা করিয়া ফেলে! এই ভাবিয়া) আতঙ্কিত হইলাম, এমনকি আমার চেহারা দৃষ্টে খোবায়েব আমার আতঙ্ক অনুভব করিতে পারিলেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি ভয় করিতেছ, আমি শিশুটিকে মারিয়া ফেলিব? ইনশাআল্লাহ আমি কখনও তাহা করিব না।

ঐ মহিলা আরও বর্ণনা করিয়াছে যে, খোবায়েবের ন্যায় এইরূপ সৌভাগ্যশালী বন্দী আমি আর কখনও দেখি নাই। তাঁহাকে আমি দেখিয়াছি, তাজা আঙ্গুরের ছড়া হাতে লইয়া আঙ্গুর খাইতেছেন, অথচ তখন মক্কার এলাকায় কোন প্রকার ফলের মৌসুমই

নহে, তদুপরি তিনি শৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়াছেন। ঐ আঙ্গুর একমাত্র আল্লার বিশেষ দান ছিল যাহা খোবায়েবকে তিনি দান করিয়াছিলেন।

অবশেষে একদিন শত্রুগণ খোবায়েব (রাঃ)কে শহীদ করার জন্য হরম শরীফের এলাকার বাহিরে লইয়া গেল। হত্যাস্থলে পৌঁছিবার পর খোবায়েব (রাঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, আমাকে দুই রাকাত নামায পড়িবার সময় দান কর। তিনি দুই রাকাত নফল নামায পড়িলেন এবং শত্রুদলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা ভাবিতে পার, আমি মৃত্যুর ভয়ে ঘাবরাইয়া গিয়াছি, নতুবা আরও দীর্ঘ সময় নামায পড়িতাম। খোবায়েব (রাঃ)ই সর্বপ্রথম এই সুন্দর সুন্নতটি জারি করিলেন যে, বন্দী অবস্থায় ধীর-স্থিরে মৃত্যু আসিলে দুই রাকাত নফল নামায পড়িবে। অতঃপর খোবায়েব (রাঃ) শত্রুদের প্রতি বদ-দোয়া করিলেন—

اَللّٰهُمَّ اَحْصِهِمْ عَدَدًا وَاقْتُلْهُمْ بِدَدًا وَلَا تُبْقِ مِنْهُمْ اَحَدًا

"হে আল্লাহ! ইসলামের এইসব শত্রুগণকে এক এক করিয়া গণনা করিয়া রাখ এবং প্রত্যেককে ধ্বংস কর, তাহাদের একজনকেও জীবিত রাখিও না।" অতঃপর তিনি একটি পদ্য পাঠ করিলেন। (বোখারী শরীফে ঐ পদ্যের দুইটি মাত্র পংক্তি উল্লেখ আছে পূর্ণ পদ্যটি এই—)

لَقَدْ جَمَعَ الْاَحْزَابُ حَوْلِىْ وَاَلَّبُوْا — قَبَائِلَهُمْ وَاسْتَجْمَعُوْا كُلَّ مَجْمَعٍ

শত্রুদল তাহাদের বংশধরকে তামাশা দেখিবার জন্য আমার চতুষ্পার্শ্বে একত্র করিয়াছে এবং প্রতিটি দলকে ডাকিয়া আনিয়াছে।

وَكُلُّهُمْ مُبْدِى الْعَدَاوَةِ جَاهِدٌ — عَلَىَّ لِاَنِّىْ فِىْ وَثَاقٍ مُضَيَّعِ

তাহাদের প্রত্যেকেই আমার প্রতি শত্রুতা প্রকাশকারী, আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী। (তাহারা এতদূর সুযোগ পাইয়াছে শুধু) এই কারণে যে, আমি শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

وَقَدْ جَمَعُوْا اَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ — وَقُرِّبَتْ مِنْ جِذْعٍ طَوِيْلٍ مُمَنَّعِ

তাহারা তামাশা দেখিতে স্ত্রী পুত্রগণকে একত্র করিয়াছে এবং আমাকে শূলি দিবার জন্য সুরক্ষিত দীর্ঘ শূলি কাষ্ঠের নিকটবর্তী উপস্থিত করা হইয়াছে।

اِلَى اللّٰهِ اَشْكُوْا غُرْبَتِىْ ثُمَّ كُرْبَتِىْ - وَمَا اَرْصَدَ الْاَحْزَابُ لِىْ عِنْدَ مَصْرَعِىْ

আমার সমুদয় অভিযোগ আল্লার দরবারে—স্বদেশ হইতে দূরে হওয়ার অভিযোগ, কষ্ট-ক্লেশ সমূহের অভিযোগ এবং শত্রুদল আমার হত্যাস্থলে যেসব ব্যবস্থা করিয়াছে সেই সবের অভিযোগ।

فَذَا الْعَرْشِ صَبِّرْنِىْ عَلٰى مَا يُرَادُ بِىْ ـ فَقَدْ بَضَعُوْا لَحْمِىْ وَقَدْ يَاسَ مَطْمَعِىْ

হে মহান আরশের মালিক! আমার জন্য যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে সেই সব সহ্য করতঃ ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা আমাকে দান কর, শত্রুগণ আমার মাংস টুকরা টুকরা করার ব্যবস্থা করিয়াছে এবং আমার জীবনের আশা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

وَذٰلِكَ فِىْ ذَاتِ الْاِلٰهِ وَاِنْ يَّشَا ـــ يُبَارِكْ عَلٰى اَوْصَالِ شِلْوٍ مُّمَزَّعٍ

আমার এই আপদ-বিপদ একমাত্র আল্লার (সন্তুষ্টির) জন্য। তিনি ইচ্ছা করিলে আমার ছিন্নভিন্ন দেহের অঙ্গসমূহে বরকত, মঙ্গল ও সৌভাগ্য দান করিতে পারেন।

وَقَدْ خَيَّرُوْنِىْ الْكُفْرَ وَالْمَوْتُ دُوْنَهٗ ـ وَقَدْ هَمَلَتْ عَيْنَاىَ مِنْ غَيْرِ مَجْزَعٍ

শত্রুগণ মৃত্যুকে আমার সম্মুখে রাখিয়া কুফর—ইসলামদ্রোহিতা অবলম্বন করতঃ পরিত্রাণ পাওয়ার সুযোগ আমাকে প্রদান করিয়াছিল, তখন দর দর করিয়া আমার চক্ষুদ্বয় (হইতে অশ্রু) বহিয়া পড়িল; মৃত্যু-চিন্তায় নহে।

وَمَا بِىْ حِذَارُ الْمَوْتِ اِنِّىْ لَمَيِّتٌ ـــ وَلٰكِنْ حِذَارِىْ جَحْمُ نَارٍ مُلَفَّعٍ

মৃত্যুর দরুণ আমার কোন চিন্তা নাই, একদিন আমাকে মরিতে হইবেই; আমার একমাত্র চিন্তার কারণ—শিখাযুক্ত অগ্নিকুণ্ড—জাহান্নাম।

وَلَسْتُ اُبَالِىْ حِيْنَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا ـــ عَلٰى اَىِّ جَنْبٍ كَانَ فِى اللّٰهِ مَضْجَعِىْ

আমি যখন মোসলমান অবস্থায় মৃত্যু বরণ করিতেছি তখন আমার কোনই ভয় নাই; আল্লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে কোন অবস্থাতেই আমার মৃত্যু হউক।

فَلَسْتُ بِمُبْدٍ لِلْعَدُوِّ تَخَشُّعًا ـــ وَلَا جَزَعًا اِنِّىْ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعِىْ

আমি শত্রুর নিকট কস্মিনকালেও নতি স্বীকার করিব না বা বিহ্বলতা প্রকাশ করিব না, কারণ আমি আল্লার নিকটই পৌঁছিতেছি।

(শত্রুরা খোবায়েব (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তুমি কি পছন্দ কর, মোহাম্মদকে তোমার স্থলে দণ্ডায়মান করা হউক? তিনি বলিলেন, আমার প্রাণ বিসর্জনের পরিবর্তে তাঁহার পায়ে সামান্য কাঁটা বিদ্ধ হউক তাহাও আমি পছন্দ করি না।) অতঃপর বদরের জেহাদে নিহত হারেছের পুত্র ওকবা তাঁহাকে শহীদ করিল।

ঐ ছাহাবীগণের দল-নেতা আছেম (রাঃ)ও বদরের জেহাদে মক্কাবাসী কাফেরদের কোন এক প্রধানকে হত্যা করিয়াছিলেন, সেই নিহত ব্যক্তির আত্মীয়গণ আছেম রাজিয়াল্লাহু

তায়ালা আনহুর নিহত হওয়ার প্রমাণ চাক্ষুসরূপে দেখিয়া প্রাণ ঠাণ্ডা করিবার জন্য তাঁহার নিহত দেহের কোন একটি অংশ কাটিয়া আনিবার জন্য লোক পাঠাইল। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার লাশকে কাফেরদের হস্ত হইতে পবিত্র রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন; মেঘ খণ্ডের ন্যায় মৌমাছির একটি বিরাট দল প্রেরণ করিলেন। মৌমাছিগুলি আছেম রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দেহকে ঘিরিয়া রাখিল, শত্রুগণ তাহার নিকটেও আসিতে পারিল না। তারপর পাহাড়ী ঢল নামিয়া আসিল এবং আছেম রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর লাশকে নিখোঁজ করিয়া দিল।

ব্যাখ্যা ঃ— খোবায়েব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে ইসলামী ইতিহাসের কিতাবসমূহে বর্ণিত আছে—বিশিষ্ট ছাহাবী যোবায়ের (রাঃ) এবং মেক্‌দাদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (কাফেরগণ খোবায়েব (রাঃ)কে শহীদ করতঃ শূলীকাষ্ঠের উপর লটকাইয়া রাখিয়াছিল।) রসুলুল্লাহ (দঃ) উক্ত ছাহাবীদ্বয়কে প্রেরণ করিলেন, গোপনে নিহত খোবায়েব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর লাশ নিয়া আসিবার জন্য। তাঁহারা ঘটনাস্থলে পৌঁছিলেন—তখনও খোবায়েব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর লাশ তাজা ছিল; কোনরূপ বিকৃত হইয়াছিল না এবং তাঁহার শরীরের প্রবাহিত রক্ত বর্ণে রক্ত ছিল বটে, কিন্তু সুগন্ধে ছিল কস্তুরী। যোবায়ের (রাঃ) ঐ লাশ নামাইয়া আনিলেন এবং মদীনা পানে যাত্রা করিলেন। এদিকে কাফেররা এই ঘটনার খোঁজ পাইয়া সত্তরজন লোক তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল। যোবায়ের (রাঃ) অগত্যা ঐ লাশ মাটির উপর রাখিয়া দিলেন। খোদার কুদরতের লীলা—তৎক্ষণাৎ জমিন খোবায়েবের লাশকে গিলিয়া ফেলিল; এই সূত্রেই খোবায়েব (রাঃ)কে "বালীউল-আরজ—জমিনের গলাধঃকৃত" বলা হইয়া থাকে।

খোবায়েব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গী যায়েদ ইবনে দাছেনা (রাঃ) তিনিও বদরের জেহাদে এক কাফের প্রধানকে হত্যা করিয়াছিলেন। শত্রুগণ তাঁহাকেও ঐ নিহত কাফেরের আত্মীয়দের নিকট বিক্রি করিয়া ফেলিল। তাহারা তাঁহাকেও খোবায়েব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ন্যায় শহীদ করিয়া ফেলিয়াছিল।

পাঠকবর্গ! বর্তমান লাগামহীন তর্কের যুগে নব্য উৎপাদিত অনেক লোকের যুক্তি-তর্কে হয়ত এই তর্কের মীমাংসা কঠিন বোধ হইবে যে, এইসব ছাহাবীগণকে আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের আক্রমণের সময় রক্ষা করতঃ জীবন বাঁচাইবার কোন ব্যবস্থা করিলেন না, অথচ এস্থলে দেখান হইয়াছে যে, আছেম রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মৃত লাশকে শত্রুদের স্পর্শ হইতে মৌমাছি দল পাঠাইয়া রক্ষা করিয়াছেন এবং খোবায়েব রাজিয়াল্লাহু আনহুর লাশকে জমিনে গলাধঃকরণ করাইয়া কাফের শত্রুদের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার স্বাধীন ইচ্ছা ও বিচিত্রময় অসীম কুদরতের লীলার প্রতি যাহাদের শ্রদ্ধা আছে তাহাদের জন্য এইসব প্রশ্নের মীমাংসা সহজ। আল্লাহ তায়ালা فعال لما يريد যখন যাহা ইচ্ছা হয় করিয়া থাকেন, তাঁহার কার্যাবলী তাঁহার হেকমত

ও নৈপুন্যতা সাপেক্ষ বটে, কিন্তু আমাদের যুক্তি তর্কের কোন ধারও ধারে না বা উহার উপর নির্ভরও করে না। প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও কবি—শেখ সা'দী (রঃ) কোরআনে বর্ণিত ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ হযরত ইয়াকুব ও তাঁহার পুত্র ইউসুফ আলাইহেচ্ছালামের ঘটনার এইরূপ অসামঞ্জস্যজনক একটি অংশকে উল্লেখ করিয়া উহা যে আল্লাহ তায়ালার স্বাধীন ইচ্ছা ও অসীম কুদরতের বিচিত্র লীলা তাহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তিনি বলেন—

ز مصرش بوئے پیراهن شنیدی — چرا در چاه کنعانش نه دیدی

ইয়াকুব আলাইহেচ্ছালামের পুত্র ইউছুফ (আঃ)কে তদীয় ভ্রাতাগণ স্বীয় দেশ কেনানের এক কূপে ফেলিয়া দিয়া তাঁহাকে বাঘে খাইয়া ফেলিয়াছে বলিয়া ভান করিয়াছিল। অতঃপর কোন এক পথিক বণিকদল সেই কূপের পানি আনিতে গেলে বালক ইউসুফ তাহাদের হস্তগত হইয়া মিশর দেশে পৌঁছিলেন এবং তথায় তাঁহার জীবনের উপর নানাপ্রকার পরিবর্তন আসিল; বহুকাল ক্রীতদাস রহিলেন, দশ বৎসর কারাগারে জীবন কাটাইলেন। অবশেষে তিনিই আবার মিশরের অধিপতি হইলেন। ইউসুফ আলাইহেচ্ছালাম স্বীয় পিতা ইয়াকুব আলাইহেচ্ছালামের বিশেষ আদরণীয় ছিলেন; পিতা পুত্রকে হারাইয়া শোকে বিহ্বল হইয়া গিয়াছিলেন, এমনকি তাঁহার দৃষ্টিশক্তিও লোপ পাইয়া গিয়াছিল।

ইউছুফ (আঃ) মিশরাধিপতি হওয়ার পর দেশে দুর্ভিক্ষের দরুন তাঁহার শত্রু ভাইগণ পর-পর দুইবার তাঁহার নিকট সাহায্যের জন্য উপস্থিত হন; এই সময়ও বহু ঘটনা ঘটে। অতঃপর ইউছুফ (আঃ) স্বীয় হাল-অবস্থার সুসংবাদবাহক এক ব্যক্তিকে সুদূর মিশর হইতে কেনান দেশে পিতা ইয়াকুব (আঃ)-এর প্রতি প্রেরণ করিলেন এবং তাহার হস্তে স্বীয় জামা নিদর্শন স্বরূপ প্রেরণ করিলেন। খোদার কুদরতের বিচিত্র লীলা—জামা-বাহক লোকটি এখনও সুদূর মিশরেই রহিয়াছে তথা হইতে যাত্রাও করে নাই, এমতাবস্থায় শোক-বিহ্বল দৃষ্টি হারা পিতা ইয়াকুব (আঃ) কেনান দেশে থাকিয়া ঐ জামার মধ্য হইতে পুত্র ইউছুফের সুঘ্রাণ অনুভব করিতে পারিয়া সকলকে হযরত ইউছুফের সংবাদ প্রদান করিলেন।

শেখ সা'দী (রঃ) বলেন—ঘরের কোণে, স্বগ্রামের কূপে যখন ইউছুফ পতিত ছিলেন, পিতা ইয়াকুব (আঃ) তখন তাঁহার কোন খোঁজ পাইলেন না, আর এখন দীর্ঘকাল পর সুদূর মিশর হইতে জামার সুঘ্রাণ অনুভব করিতে সক্ষম হইলেন। এ সবই হইল—আল্লাহ তায়ালার স্বাধীন ইচ্ছা ও অসীম কুদরতের বিচিত্র লীলা; এখানে কোন তর্ক ও প্রশ্নের মীমাংসা নাই; প্রশ্ন উত্থাপনও নিছক অবাস্তর।

বীরে-মউনার ঘটনা

চতুর্থ হিজরী সনের আরম্ভেই এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। "বীরে-মউনা" একটি স্থানের নাম; তথায় এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাই উক্ত ঘটনা এই নামে প্রসিদ্ধ। ঘটনার বিবরণ এই যে, মক্কার নিকটস্থ নজদ এলাকা হইতে বনু-আমের গোত্রীয় সর্দার আবুবরা

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাইলেন, সেই সম্পর্কে সে কোন হাঁ, না করিল না, বরং অনুরোধ জ্ঞাপন করিল যে, আমাদের এলাকায় লোকদের ইসলামের প্রতি আকর্ষণ আছে, আপনি কিছু সংখ্যক মোবাল্লেগ তথায় প্রেরণ করুন। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, নজদ এলাকায় লোক প্রেরণ করিতে আমার আশঙ্কা বোধ হয়। আবুবরা বলিল, আমি তাহাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম। (আরব দেশে এইরূপ দায়িত্ব গ্রহণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইত, বিশেষতঃ এলাকার সর্দারের পক্ষ হইতে, তাই) রসুলুল্লাহ (দঃ) সত্তর জন বিশিষ্ট ছাহাবীকে তথায় প্রেরণ করিলেন। ঐ ছাহাবীগণ অতি উচ্চ মর্তবার ছিলেন; তাঁহারা এরূপ খোদাভক্ত ছিলেন যে, দিনভর লাকড়ি সংগ্রহ করিয়া উপার্জিত অর্থ দান-খয়রাত করিতেন এবং রাতভর কোরআন শরীফ শিক্ষা দিতেন ও নামাযরত থাকিতেন।

নজদ এলাকায় আরও একজন প্রধান ছিল, তাহার নাম ছিল আমের ইবনে তোফায়েল, সে আবু বরা সর্দারের ভাতিজা ছিল; সে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষী ছিল। পূর্বে একবার সে কতিপয় দাবী লইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়াছিল। সে এই দাবী জানাইয়াছিল যে, আপনার ও আমার মধ্যে, তিনটি বিষয়ের কোন একটি নির্দ্ধারিত করিতে হইবে—(১) আপনি গ্রাম্য এলাকার প্রধান থাকিবেন, আমি শহর এলাকার প্রধান থাকিব, কিম্বা (২) আমি আপনার পর আপনার স্থলাভিষিক্ত নির্দ্ধারিত হইব, নচেৎ (৩) আমি হাজার হাজার লোক লইয়া আপনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইব। হযরত (দঃ) তাহার বিরুদ্ধে আল্লার সাহায্য প্রার্থনা করতঃ দোয়া করিলেন—اللهم اكفنى عامرا "হে আল্লাহ! আমেরের মোকাবিলায় তুমি আমার পক্ষে যথেষ্ট হইয়া যাও।" এরূপ বিদ্বেষমূলক কথাবার্তা কিছুদিন পূর্বে তাহার সঙ্গে হইয়াছিল। এখন যখন তাহার এলাকায় তাহারই চাচার দায়িত্বে রসুলুল্লাহ (দঃ) লোক পাঠাইলেন তখন হযরত (দঃ) তাহার প্রতি একটি লিপি লিখিয়া স্বীয় প্রেরিত লোকদের হস্তে দিয়া দিলেন। তাহার বস্তির অদূরে "বীরে-মউনা" নামক স্থানে ছাহাবী দল পৌঁছিয়া স্বীয় দলের বিশিষ্ট ছাহাবী হারাম ইবনে মেলহান (রাঃ)কে পত্র বাহকরূপে আমেরের নিকট পাঠাইয়া অন্যান্য ছাহাবীগণ সেই স্থানে অপেক্ষমান রহিলেন। ঐ ছাহাবী পত্র লইয়া পৌঁছিলে আমের ঐ পত্রের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করিল না, বরং তাহার ইঙ্গিতে অন্য এক ব্যক্তি ঐ ছাহাবীর প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করিল, তিনি তথায় শহীদ হইয়া গেলেন। অতঃপর আমের কতিপয় গোত্রের লোকগণকে একত্র করিয়া অবশিষ্ট ছাহাবীগণকে ঘেরাও করিয়া ফেলিল। ছাহাবীগণ হঠাৎ আক্রমণের মোকাবিলায় অস্ত্রধারণ করিয়া সকলেই তথায় শাহাদৎ বরণ করিলেন, মাত্র একজন প্রাণে বাঁচিয়া রহিলেন।

রাজীর ঘটনা ও বিরে-মউনার ঘটনা—এই মর্মান্তিক ঘটনাদ্বয় নিকটবর্তী সময়ের মধ্যেই সংঘটিত হয়, এমনকি প্রায় এক সঙ্গেই হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঘটনাদ্বয়ের সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) এই ঘটনায় এতদূর মর্মাহত ও শোকাবিষ্ট হইলেন যে, এরূপ আর কখনও হন নাই, এমনকি ঐ সকল গোত্র সমূহের প্রতি দীর্ঘ এক মাসের অধিককাল ফজরের নামাযের মধ্যে বদ-দোয়া করতঃ "কুনুতে-নাযেলা" পড়িলেন। যোরকানী কিতাবে বর্ণিত আছে, স্বরের মহামারীতে ঐ গোত্রগুলির সাতশত লোক মরিল। ঘটনার মূল আমের ইবনে তোফায়েলও প্লেগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

১৪৬৫। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সত্তর জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে এক মহৎ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিলেন, যাঁহারা কোরআন-বিশেষজ্ঞরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। বিরে-মউনা নামক স্থানে তাঁহারা "রেয়েল" ও "জাকওয়ান" গোত্রদ্বয় কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন, আমরা তোমাদিগকে কিছু বলিবার বা কিছু করিবার আসি নাই, আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু ছাল্লাল্লাহু অলোইহে অসাল্লামের নির্দেশিত একটি কার্যের উদ্দেশ্যে এই পথ অতিক্রম করিতেছি মাত্র। শত্রুরা তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাদিগকে শহীদ করিয়া ফেলিল। হযরত (দঃ) হত্যাকারী গোত্র সমূহের প্রতি প্রতিশাপ করতঃ দীর্ঘ এক মাস "কুনুতে-নাযেলা" পড়িলেন। ইতিপূর্বে আর কখনও আমরা "কুনুতে-নাযেলা" পড়ি নাই।

১৪৬৬। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—"রেয়েল", "জাকওয়ান" ও "ওছাইয়া" গোত্রত্রয় (হইতে তাহাদের প্রতিনিধি আবুবরা) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট (ইসলামের প্রতি স্বীয় এলাকায় লোকদের আকৃষ্টতার কথা উল্লেখ করিয়া ইসলামের শিক্ষা ও তবলীগের দ্বারা) বিরোধী পার্টির মোকাবিলায় সাহায্য প্রার্থনা করিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) মদিনাবাসীদের হইতে সত্তর জন ছাহাবীকে তাহাদের সাহায্যে পাঠাইলেন। ঐ ছাহাবীগণ কোরআন-বিশেষজ্ঞরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাঁহারা (জীবিকা নির্বাহ ও দান-খয়রাতের জন্য) সমস্ত দিন লাকড়ি কুড়াইতেন এবং সারা রাত্র নফল নামাযে কাটাইতেন।

ছাহাবী দল যখন "বীরে-মউনা" নামক এলাকায় পৌঁছিলেন তখন (দুষ্ট আমের ইবনে তোফায়লের আহ্বানে) ঐ গোত্রত্রয়ের লোকগণই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ছাহাবীগণকে মারিয়া ফেলিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ সংবাদ পাইয়া "রেয়েল", "জাকওয়ান", "ওছাইয়া" ও "বনু-লেহ্ইয়ান" গোত্রসমূহের প্রতি বদ-দোয়া করিয়া দীর্ঘ এক মাস পর্যন্ত ফজরের নামাযের মধ্যে "কুনুতে-নাযেলা" পড়িলেন।

আনাছ (রাঃ) আরও বলিয়াছেন, ঐ ঘটনায় শহীদানের পক্ষে কোরআন শরীফে একটি আয়াত নাযেল হইয়াছিল; পরে উহার তেলাওয়াত রহিত হইয়াছে।

بَلِّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا۔

"আমাদের সম্প্রদায়ের সকলকে জানাইয়া দাও, আমরা প্রভু পরওয়ারদেগারের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি, তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন।"

১৪৬৭। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার মাতুল (হারাম-ইবনে-মেলহান (রাঃ)কে) সত্তর জন সহযাত্রীর সঙ্গে হযরত (দঃ) এক এলাকায় প্রেরণ করিলেন। তথাকার অমোসলেমদের এক সরদার—আমের ইবনে তোফায়েল ইতিপূর্বে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া তিনটি দাবীর কোন একটি গ্রহণ করিতে বলিয়াছিল—সে বলিয়াছিল, আপনি পল্লী এলাকার প্রধান থাকিবেন, আমি শহর এলাকার প্রধান হইব, কিম্বা আমি আপনার স্থলাভিষিক্তরূপে নির্দ্ধারিত থাকিব, নচেৎ আমি স্বীয় গোত্রের হাজার হাজার সৈন্য লইয়া আপনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইব। কিছুকাল পরে সে একস্থানে প্লেগাক্রান্ত হইয়া পড়ে এবং তথা হইতে বাড়ী আসিবার জন্য ঘোড়ায় আরোহণ করিলে অশ্ব পৃষ্ঠেই তাহার মৃত্যু ঘটে।

আমের ইবনে তোফায়েল যতদিন জীবিত ছিল ইসলাম বিদ্বেষী ছিল; তাহার এলাকায় উপস্থিত হইতে ছাহাবী দল আশঙ্কা বোধ করিতেছিলেন, তাই দলের সকলে একত্রে তথায় উপস্থিত না হইয়া দলের দুই ব্যক্তি—হারাম ইবনে মেলহান (রাঃ) ও অপর আর একজন সেই এলাকার প্রতি যাত্রা করিলেন। অন্যান্য সকলকে পথিমধ্যে নিকটবর্তী একস্থানে অপেক্ষমান রাখিয়া গেলেন এবং বলিয়া গেলেন যে, আপনারা এই স্থানেই থাকুন—যাবৎ না আমরা দুইজন ফিরিয়া আসি। যদি ঐ এলাকাস্থ লোকগণ আমাদিগকে নিরাপত্তা প্রদান করে তবে আপনারা সকলেই মূল উদ্দেশ্যের উপর স্থির থাকিবেন এবং সকলে সমবেতভাবে নির্দ্ধারিত এলাকায় উপস্থিত হইয়া ইসলাম প্রচার কার্যে আত্মনিয়োগ করিব, আর যদি তাহারা আমাদিগকে মারিয়া ফেলে তবে আপনারা এস্থান হইতেই প্রত্যাবর্তন করিয়া নিজ দেশের লোকদের সঙ্গে যাইয়া মিশিবেন।

হারাম-ইবনে-মেলহান (রাঃ) ঐ এলাকায় উপস্থিত হইয়া তথাকার লোকদিগকে বলিলেন, আল্লার রসুলের প্রেরিত বাণী প্রচারে তোমরা আমাকে নিরাপত্তা দিবে কি? তিনি তাহাদের সঙ্গে এই সম্পর্কে আলাপ করিতেছিলেন হঠাৎ তাহারা এক ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করিল, সে ঐ ছাহাবীকে পেছন হইতে বর্শাঘাত করিল। বর্শা তাঁহার দেহ ভেদ করিয়া গেল। (দ্বীনের জন্য এই আঘাতকে তিনি ধন্য মনে করিলেন) এবং প্রবাহিত রক্ত কোশ ভরিয়া স্বীয় নাকে-মুখে মাখিলেন এবং বলিলেন, فزت ورب الكعبة "মহান কা'বার প্রভুর শপথ—আমি সফলকাম হইয়াছি।"

অতঃপর তাঁহার সঙ্গী দ্বিতীয় ব্যক্তি অপেক্ষমান সহযাত্রীগণের সঙ্গে মিলিত হইলেন, কিন্তু তাঁহারা শত্রুগণ কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া সকলেই শাহাদৎ বরণ করিলেন. শুধুমাত্র একজন পাহাড়ের উপর উঠিয়াছিলেন তিনি রক্ষা পাইলেন।

১৪৬৮। **হাদীছ** :—ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিরে-মউনার ঘটনায় ছাহাবীদল যখন শহীদ হইলেন এবং তাঁহাদের দলীয় আম্র ইবনে উমাইয়া (রাঃ) শত্রু হস্তে বন্দী হইলেন তখন শত্রু পক্ষের সরদার আমের ইবনে তোফায়েল আম্র ইবনে উমাইয়া (রাঃ)কে একটি শব দেহের প্রতি ইশারা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইনি কে? আম্র ইবনে উমাইয়া (রাঃ) বলিলেন, ইনি আমের ইবনে ফোহায়রা (রাঃ)। আমের ইবনে তোফায়েল বলিল, আমি দেখিয়াছি, তিনি নিহত হওয়ার পর তাঁহাকে আসমানের প্রতি উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে, অতঃপর জমিনে রাখা হইয়াছে, এমনকি তাঁহাকে আসমানে উঠাইবার দৃশ্য এখনও আমার নজরে ভাসিতেছে।

ছাহাবী দলের শহীদ হওয়ার সংবাদ হযরত নবী (দঃ) প্রাপ্ত হইলেন এবং সকলকে তাঁহাদের মৃত্যু সংবাদ প্রদান করতঃ ইহাও বলিলেন, তাঁহারা আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা যেন তাঁহাদের অন্যান্য ভাই-বন্ধুগণকে জ্ঞাত করিয়া দেন যে, তাঁহারা প্রভুর দানে সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং প্রভুও তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

ব্যাখ্যা :—আমের ইবনে ফোহায়রা (রাঃ) বিশিষ্ট ছাহাবী। রসুলুল্লাহ (দঃ) আবুবকর (রাঃ)কে সঙ্গে লইয়া মক্কা হইতে মদীনায় হিজরতকালে তিন দিন "ছওর" পর্বতের গুহায় লুক্কায়িত ছিলেন। আমের ইবনে ফোহায়রা (রাঃ)ই রাত্রি বেলা গোপনে তাঁহাদের খাদ্য যোগাইতেন, ঐ সময় তিনি আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার কোন এক আত্মীয়ের ক্রীতদাস ছিলেন।

১৪৬৯। **হাদীছ** :—আছেম-আহ্ওয়াল (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আনাছ (রাঃ)কে (বেতের) নামাযের মধ্যে দোয়া-কুনুত পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, হাঁ পড়া চাই। অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, দোয়া-কুনুত রুকুর পূর্বে না পরে পড়া হইবে? আনাছ (রাঃ) বলিলেন, রুকুর পূর্বে। আমি বলিলাম, এক ব্যক্তি আপনার তরফ হইতেই বর্ণনা করিয়াছে যে, উহা রুকুর পরে। আনাছ (রাঃ) বলিলেন, সে ভুল বুঝিয়াছে। (ঐ নিয়ম কুনুতে-নাযেলা সম্পর্কে ছিল এবং সাময়িক ছিল;) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সত্তরজন কোরআন নিবেশেষজ্ঞ বিশিষ্ট ছাহাবীকে এক এলাকায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। তথাকার কাফেররা তাঁহাদিগকে শহীদ করিয়া ফেলিয়াছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সেই কাফেরগণের প্রতি অভিশাপ করিয়া দীর্ঘ এক মাস (ফজরের নামাযে) কুনুত পড়িয়াছিলেন, সেই কুনুত রুকুর পরে ছিল।

খন্দকের জেহাদ

"খন্দক" আরবী শব্দ উহার অর্থ পরিখা। এই যুদ্ধে শত্রু দল অসংখ্য সৈন্য সমাবেশ করতঃ মদীনা শহরকে পরিবেষ্টিতাকারে আক্রমণ চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনা শহর রক্ষার্থে শহরের প্রবেশ পথের বিস্তৃত

এলাকায় পরিখা খনন করিয়াছিলেন, তাই এই জেহাদকে খন্দকের জেহাদ বলা হয়। এই জেহাদে শত্রুপক্ষ আরবের বিভিন্ন দলকে একত্র করিয়া বিরাট আকারে অভিযান চালাইয়াছিল বলিয়া ইহাকে আহ্যাবের জেহাদও বলা হয়। "আহ্যাব" শব্দের অর্থ বিভিন্ন দল।

এই জেহাদ সম্পর্কে একদল ঐতিহাসিকের মত এই যে, উহা পঞ্চম হিজরী সনে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইমাম বোখারী (রঃ) অন্য একদলের মত সমর্থন করতঃ বলেন যে, উহা চতুর্থ হিজরী সনের শওয়াল মাসে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সূত্রে উহা ওহোদের জেহাদের পরবর্তী বৎসরই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মূল ঘটনার বিবরণ এই যে, ইহুদীরা মোসলমানদের বিরুদ্ধে বিষময় বিদ্বেষ পোষণ করিতে ছিল, বিশেষতঃ বনু-নজীর ইহুদী গোত্র। কারণ, তাহাদিগকে মদীনা হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল, যাহার বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। মোসলমানদের বিরুদ্ধে তাহাদের বিদ্বেষ চরমে পৌঁছিল, কিন্তু প্রত্যক্ষরূপে কিছু করিবার সাহস তাহাদের ছিল না।

ওহোদের যুদ্ধে মক্কার কোরেশরা মোসলমানদের বিরাট ক্ষতি সাধনের সুযোগ পাইয়াছিল। কিন্তু মোসলমানদের বীরত্ব, তাঁহাদের আত্মত্যাগ এবং তাঁহাদের ধর্ম ও আদর্শের জন্য তাঁহারা যে কত বড় সুকঠিন—যুদ্ধ ক্ষেত্রে যে, তাঁহারা কি ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়ায় সেই অভিজ্ঞতা কোরেশরা বদরে ত ভালরূপেই লাভ করিয়াছিল ওহোদ প্রাঙ্গণেও সেই অভিজ্ঞতা তাহাদের কম লাভ হইয়াছিল না। যদ্দরুন ওহোদের অঙ্গন ত্যাগকালে দলপতি আবু সুফিয়ানের আস্ফালন—পর বৎসর বদর ময়দানে আবার যুদ্ধ হইবে—উহা কার্যে পরিণত করা দূরের কথা অন্ততঃ মুখ রক্ষার্থে বদর প্রান্তের ধারে-কাছেও তাহারা আসে নাই। অথচ মোসলমানগণ স্বয়ং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নেতৃত্বে নির্দ্ধারিত সময়ে বদর-প্রান্তরে পৌঁছিয়া আট দিন কোরেশদের অপেক্ষায় তথায় অবস্থান করিয়াছিল।

কোরেশ কাফেররা ভালরূপেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল যে, যেমন-তেমন যুদ্ধে মোসলমানদেরে কাবু করা সম্ভব নহে। অতএব নূতন কোন প্রচেষ্টা নিতে হইলে পূর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও অধিক শক্তিশালী অভিযানের প্রয়োজন। এই ভাবিয়া কোরেশ অধিপতি আবু সুফিয়ান সমগ্র আরবময় একটা আলোড়ন সৃষ্টি এবং ব্যাপক আয়োজন চালাইবার চেষ্টায় লাগিয়া যাওয়া স্থির করিল।

এদিকে মদীনা হইতে নির্বাসিত ইহুদী গোত্র বনু-নজীর—ওহোদের যুদ্ধে মক্কাবাসী কাফেরগণ কর্তৃক মোসলমানগণ ঘায়েল হইয়াছে, এই সংবাদ শ্রবণে তাহারা বিশেষ তৎপর হইল। তাহাদের মধ্যে একটি বিশেষ পরিকল্পনা দানা বাঁধিয়া উঠিল—মক্কাবাসীদের সঙ্গে এক যোগে সংগ্রাম চালাইয়া মোসলমানগণকে নিশ্চিহ্ন করার একটি সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা তাহারা গ্রহণ করিল। কোরায়েশরা এই সুযোগকে মূল্যবান গণ্য করিয়া স্বীয় জোটের সমুদয় গোত্রবর্গকে লইয়া মোসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের উৎসাহ প্রদর্শন করিল। ইহুদীরা অতঃপর আরবের বিশিষ্ট গোত্র মোসলমানদের বিদ্বেষপূর্ণ "গাতাফান" গোত্রের নিকটও উপস্থিত